মরুর আলো
আবু যারীফ

'আমরা আল্লাহ্‌র রঙ গ্রহণ করেছি, রঙ-এ আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।' [সূরা আল বাক্বারা : ১৩৮]

মরুর আলো

আবু যারীফ

[একটি **জ্ঞান কুটির** প্রকাশনা]

পরিবেশনায়

এদারায়ে কুরআন

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদের একান্ত ব্যক্তিগত সময় হতে অনেকটা সময়ই
ব্যয় করেছি লেখাগুলোকে গ্রন্থাকারে সজ্জিত করতে
সেই প্রিয় সহধর্মিনী **জেসমিন উম্মে যারীফ**
এবং
ভবিষ্যত কলম সৈনিক পুত্র **যারীফ আবদুল্লাহ্**

অর্পণ

মা,

যাঁর মায়া ভরা দু'টি আঁখি, স্নেহ ভরা দু'টি হাত
সদা-সর্বদা উঠে যায় মহামহিমের আরশ পানে
স্বীয় নাড়ীছেঁড়া ধন, কলিজার টুকরো
সন্তানের ভবিষ্যত কল্যাণ কামনায়–

তাঁর করকমলে

প্রসঙ্গ কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। সকল প্রশংসা দয়াময় মায়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র, অগনিত দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। অতঃপর আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা বলেন– 'আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ চাহেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।' [সূরা দাহর : ৩০]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– 'আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাক, তা যদি একটি মাত্র আয়াতও (বাক্য) হয়। বণী ইসরাঈলের কাছ থেকে শোনা কথা (গল্প-কাহিনী) বলতে পার, এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।' [বুখারী, মিশকাত ১৮৮(১)]

জ্বী, আলহামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ পাক চেয়েছেন তাই কলম তুলে নিয়েছি। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন তাই চেষ্টা করেছি আল্লাহ্‌ ও তাঁর হাবীবের আয়াত (কথা, বাক্য) মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে। প্রচেষ্টা আমার কিন্তু কবুলিয়্যাত আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে। আমার লেখনির মাধ্যমে যদি দ্বীনের এতটুকু খিদমত হয় তার পুরো কৃতিত্ব ঐ মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালার। যার হিদায়াত না পেলে আমার লেখনির ভাষা হয়তোবা কোন নাস্তিকের জয়গানই গাইতো।

যাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সু-পরামর্শে আমার নির্বাচিত কিছু লেখাকে বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি তাদেরকে আল্লাহ্‌ উত্তম প্রতিদান দিন। বইটির যা কিছু ভাল, যা কিছু উত্তম, যা কিছু কল্যাণকর তা সবার মাঝে ছড়িয়ে যাক আর ভুল-ক্রটিগুলোর দায়-দায়িত্ব আমার নিজেরই থাক। কারণ তা একান্তই আমার নিজস্ব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফসল। সুতরাং আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবার সীমাবদ্ধতাটুকু ক্ষমা করে দিয়ে উত্তম কাজটুকুর জাযায়ে খায়ের দান করুন। সকল নির্ভরশীলতা তাঁরই উপর। আমীন।

দু'আর মুহ্‌তাজ
আবু যারীফ
ঢাকা, ২৪.০৮.২০০৮ খৃষ্টাব্দ।

•বি•ষ•য়• •সূ•চী•

পথ ও পথিক

দাঁড়াও পথিক!
দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক!!
এসো, চেয়ে দ্যাখো নীলাকাশ,
দ্যাখো সবুজ বনানী।
দ্যাখো, আঁধার পেরিয়ে এসেছে নতুন ভোর,
সীরাজাম মুনিরার স্পর্শে
দেদীপ্যমান 'ইসলাম'
হাত বাড়িয়ে ডাকছে তোমায়–
'এসো সংকুচিত হৃদয় প্রসারিত করি,
বাড়িয়ে দেই দু'হাত, তীব্র আকর্ষণে
মহামহিমের পানে।
চলো এগিয়ে যাই,
জাগতিক ধ্যান-ধারণার প্রাচীর ভেঙ্গে,
জোর-জুলুম-শোষণ আর নির্যাতনের শিকড় উপড়ে ফেলে
আবুবকর, উমর, উসমান আর আলী হায়দারের মতো
আল-কুরআনের আলোকবর্তিকা হাতে,
আলো ঝলমল, আশাদীপ্ত, শংকাহীন
সীরাতুল মুস্তাকিমের দিকে,
যে পথ পৌঁছে দিবে
(আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশ্বাসী বান্দাদের ভীড়ে।
পথিক নয় পথ খুঁজে নিবে তারে ॥'

মুসলমানের বন্ধু কে?

আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের, যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, যিনি মহাক্ষমাশীল বিচার দিনের মালিক এবং দরূদ ও সালাম আল্লাহ্‌র হাবীব সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর প্রতি। আমরা আবারও আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করছি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মানুষ মাত্রই সঙ্গপ্রিয়। কোন মানুষই একাকী কোথাও থাকতে চায় না যদি সে স্থান জান্নাতও হয়। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আদম (عليه السلام)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ্ পাক তাঁকে সৃষ্টি করে যখন জান্নাতে থাকতে দিলেন তখন জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতরাজি ভোগ করার পরও তিনি একাকীত্বের যন্ত্রণায় একজন সঙ্গীর জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট দরখাস্ত করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক আদম (عليه السلام)-এর সঙ্গীনি হিসেবে হযরত হাওয়াকে (عليها السلام) সৃষ্টি করলেন এবং হযরত আদমকে (عليه السلام) একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। তাই সমাজবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে থাকাটা আদম-সন্তানের স্বভাবজাত ধর্ম। তবে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে তখনই যখন তাদের পরস্পরের মাঝে থাকে অকৃত্রিম ও প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। সুতরাং একজন মানুষের জীবনে অকৃত্রিম ও প্রকৃত বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে বন্ধুত্ব গ্রহণের পূর্বে মু'মিন-মুসলমানের জীবনে প্রকৃত বন্ধু কারা? কী তাদের পরিচয়? প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকাটা একান্ত অপরিহার্য। আর এ ব্যাপারে জানার উৎস যদি হয় আল-কুরআন তবেতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশই থাকে না। কারণ আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

'এ কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট জীবন বিধান এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য দিক নির্দেশিকা ও উপদেশ স্বরূপ।' (সূরা আল ইমরান :১৩৮)

তাহলে এবার আল কুরআনের পাতায় দৃষ্টি বুলাই, দেখা যাক বন্ধুত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনে কী বলা হয়েছে। সূরা আল মায়িদাহ ৫৫ ও ৫৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾
وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

'নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকার বন্ধু হলেন আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও মু'মিনগণ– (আর এসব মু'মিন হলেন তারা) যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে (সেই সব লোকের সমন্বয়ে গঠিত) আল্লাহ্‌র দলইতো বিজয়ী হবে।'

অর্থাৎ আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধুর স্তর তিনটি। এক. আল্লাহ্ তায়ালা, দুই. আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) ও তিন. মু'মিনগণ।

প্রথম স্তরের বন্ধু আল্লাহ্ তায়ালা। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

'আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের অন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী বলে কেউ নেই।' (সূরা আশ-শূরা : ৩১)

আরো বলা হয়েছে–

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى
ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

'আল্লাহ্ হলেন ঈমানদারগণের বন্ধু ও অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর অবিশ্বাসীদের বন্ধু

হলো তাগুত (অশুভ শক্তি)। যারা ওদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।' (সূরা আল বাকারা : ২৫৭)

যারা প্রকৃতপক্ষেই ঈমান এনেছে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে সত্যের পথে অটল-অবিচল থেকে জীবন পরিচালনা করেছে আল্লাহ্ পাক তাদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী অভিভাবক। তিনি হিদায়াত প্রত্যাশী সত্যকামী বান্দাদেরকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করে আলোকময় সীরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান দেন। অপরদিকে যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে তাগুতকে (অপশক্তি) বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা মূলত নিজের উপর যুলুমকারী, তারা তাদের মন্দ কাজের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে নিঃসীম অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্বীয় রহমতে দাখিল করতে পারতেন; কিন্তু স্পষ্ট নির্দেশ আসার পরও যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য উপাস্য বেছে নিয়েছে তারা কখনোই হিদায়াত পাবে না, উপরন্তু তাদের উপাস্য বন্ধুরা তাদেরকে জীবনের এমন এক প্রান্তে নিয়ে যাবে যেখান থেকে সত্যের আলোক রশ্মি তাদের দৃষ্টিগোচর হবে না, তারা হারিয়ে যাবে ঘোর অমানিশায়। আল্লাহ্ পাক যাকে হিদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন, তার জন্য আর কোন হিদায়াত নেই বরং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের অনমনীয় বিদ্রোহাত্মক ভূমিকায়ই বিভ্রান্ত হবার জন্য ছেড়ে দেন। সুতরাং না আল্লাহ্ পাক তাদের কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর না তারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু খুঁজে পাবে সেদিন, যেদিন সবার কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে। প্রথম স্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে সে হবে পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাউকে সাহায্যকারী বন্ধু হিসেরে গ্রহণ করা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

'আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী বন্ধু (সেদিন হাশরের ময়দানে) থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। মূলত আল্লাহ্ যাকে সঠিক পথ দেখান না, তার কোন গতি নেই।' (সূরা আশ-শূরা : ৪৬)

আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সমস্ত মত-পথের লোককে এক দলে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু যুলুমকারীদের তিনি কোন সাহায্য করবেন না। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যুলুমকারীদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে বরণ করেছে? কেবল আল্লাহ্ইতো একমাত্র বন্ধু। তিনিই মৃতদের জীবন দানে সক্ষম এবং তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আশ-শূরা : ৮-৯)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

'ঐসকল লোকের চেয়ে ব্যর্থ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন সব উপাস্যের (দেব-দেবী, ব্যক্তি ও বস্তুর) পেছনে চলছে; যেসব উপাস্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন কাজেই আসবে না এবং ঐ উপাস্যরা তাদের উপাসনার (পূজা-অর্চনার) ব্যাপারে সম্পূর্ণ বে-খবর। কিয়ামত দিবসে শেষ বিচারের জন্য যখন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে সেদিন ঐসব উপাস্য তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তারা তাদের সকল উপাসনাই অস্বীকার করে বসবে।' (সূরা আল আহ্কাফ : ৫-৬)

আরও ইরশাদ হচ্ছে–

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

'যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। [হে মুহাম্মদ ﷺ!] তাদের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর নয়।' (সূরা আশ-শূরা : ৬)

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

'যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে বরণ করে নিয়েছে; তাদের দৃষ্টান্ত সে মাকড়সার মতো যে তার আশ্রয়ের জন্য জাল বুনছে। অথচ অন্য সব গৃহের তুলনায় মাকড়সার (জালের) গৃহই ক্ষণস্থায়ী। হায়! যদি তারা বিষয়টি বুঝতো তাহলে কতই না ভাল হতো।' (সূরা আল আনকাবুত : ৪১)

দ্বিতীয় স্তরের বন্ধু নবী ও রাসূলগণ। প্রথম স্তরে আল্লাহ্ পাকের পর দ্বিতীয় স্তরে তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন ঈমানদারগণের প্রকৃত বন্ধু। কারণ তাঁরা বিশ্বমানবতাকে তাগুতের অন্ধকার থেকে বের করে সত্যের আলোর দিকে আল্লাহ্ পাক প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

'নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকার বন্ধু হলেন আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও মু'মিনগণ– (আর এসব মু'মিন হলেন তারা) যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।' (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫৫)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

'[হে মুহাম্মদ (ﷺ)!] আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর প্রতি কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র রাসূলকে (ﷺ) বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো তারা মূলত আল্লাহ্র রহমতের তাবুতলে প্রবেশ করলো। আর আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) শুধুমাত্র সু-সংবাদদানকারী বন্ধুই নন, মন্দ কাজে যেন আমরা জড়িয়ে না পড়ি সে জন্য তিনি সতর্ককারীরূপেও প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٢٨﴾

'আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (সূরা সাবা : ২৮]

তৃতীয় স্তরের বন্ধু মু'মিনগণ (ঈমানদার মুসলমানগণ)। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﴿ﷺ﴾ পর মু'মিন অর্থাৎ বিশ্বাসীগণই মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু। কেননা মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তারা একে অপরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে সহায়তা করে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴿٧١﴾

'বিশ্বাসী নর ও বিশ্বাসী নারী একে অপরের বন্ধু; তারা সম্মিলিতভাবে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করে; সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্ এদেরই ওপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আত্ তাওবা : ৭১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ফায়সালায় ঈমানদার মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের বন্ধু। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এবং তাঁর প্রেরীত নবী-রাসূলগণের পর মু'মিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– মু'মিন কারা কিংবা কাদেরকে মু'মিন হিসেবে গণ্য করবো কিংবা কী তাদের কর্ম-পরিচয়? অধিকাংশ আ'লিমের মতে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আ'মালে সালিহ্ বা সৎকর্ম এই তিনের সমন্বয়ে হয় ঈমান। কুরআন ও সহীহ্ হাদীস যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ করেছে উক্ত বিষয় সমূহের প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাকেই মু'মিন বা বিশ্বাসী বলা হয়। যে বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অঙ্গ–

১. আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

২. আল্লাহ্র আদেশ কাজে পরিণত করার জন্য ফিরিশতাগণ নিযুক্ত আছেন।

৩. মানব সৃষ্টির শুরু হতে শেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) পর্যন্ত মানব জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন যুগে যেই সকল কিতাব বা ধর্ম গ্রন্থ নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪. ঐসকল ধর্ম গ্রন্থে আল্লাহ্র আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ মানুষের মধ্য হতে যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলের নবুওয়তে বিশ্বাস করা।

৫. আখিরাত বা পরকালের উপর বিশ্বাস রাখা।

৬. তাক্দীর (ভাল-মন্দ নির্ধারণ) আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয় বলে বিশ্বাস করা।

৭. মৃত্যুর পর কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিনে সবাইকে পুনরুত্থিত করা হবে বলে বিশ্বাস রাখা।

এই বিষয়সমূহই ঈমানের ভিত্তি। যে এই বিষয়সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাকেই মু'মিন বা বিশ্বাসী বলা হয়। এর যে কোন একটিতে অবিশ্বাস করলে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে তাকে কাফির বা অবিশ্বাসী গণ্য করা হবে।

মু'মিন মুসলমানদের ঈমান হবে দৃঢ়-অটল; পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন, স্বীয় ধন-সম্পদ কোন কিছুই তাদেরকে সত্যের পথ থেকে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ মানা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর তাই আল কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ পাক ঈমানদার বান্দাগণকে হুঁশিয়ার করে বলছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟
ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

'ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানদারীর পরিবর্তে কুফরীকে

ভালবাসে। তোমাদের কেউ যদি তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তারাই হবে আত্মঘাতী যালিম। (সূরা আত্ তাওবা : ২৩)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٩﴾

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত না রাখে। যারা এরূপ করবে, তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

আমাদের মুসলিম সমাজ সাধারণত কুরআন-হাদীস শিক্ষাকারী, শিক্ষাদানকারী আলেম সমাজকেই তৃতীয় স্তরের বন্ধু হিসেবে গণ্য করে থাকে। হাদীস শরীফেও আলেমগণকে নবী-রাসূলগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী হিসেবে আলেমগণকে বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী হিসেবে মানব সমাজকে সত্যপথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের পরামর্শ মোতাবেক চললে, তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করলে সীরাতুল মুস্তাকিমের খোঁজ পাওয়া সহজ হবে বলে আশা করা যায়। তবে সমাজে কতিপয় আলেমের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এদের অনেকেরই কুরআন-হাদীস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। কুরআন-হাদীসের সমুদ্র মন্থন না করেই এদের অনেকে সুফী-দরবেশ, মারেফত-তরীকতপন্থী পীর, আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু সেজে সরল-সহজ মুসলমানদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে গায়রুল্লাহ্র দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছে। আল্লাহ্র জমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করছে। তারা ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ্র দিকে আহ্বান করার পরিবর্তে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করছে। আল্লাহ্র দ্বীনের ঝাণ্ডার পরিবর্তে নিজস্ব মত-পথের নিশানকে সমুন্নত রাখতেই তাদের যত চাতুর্যপূর্ণ বয়ান। আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিজের জান-মাল কুরবানী করার পরিবর্তে দ্বীন ইসলামকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের মত অভিশপ্ত কাজে এরা লিপ্ত আছে। এদেরকেই বলা হয় উলামায়ে ছু' বা

অসৎ আলেম যারা কখনো মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী বন্ধু হতে পারে না। ঈমানদারগণকে সতর্ক করে আল্লাহ্ পাক বলছেন–

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

'হে ঈমানদারগণ! আলেম ও দরবেশদের অনেকে অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে চলেছে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।' (সূরা আত তাওবাহ : ৩৪)

এসব আলেমদের অনেকে আবার কুরআন-হাদীসের ভুল বা অপব্যাখ্যা করে বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে দু'পয়সা উপার্জনের ফিকিরে লিপ্ত। এদের পরিণতি ইয়াহুদী-খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ন্যায় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

'ধ্বংস তাদের জন্য যারা স্বহস্তে কিতাব (তাওরাত) (পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে) লিখে বলে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এর বিনিময়ে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করা। সুতরাং আক্ষেপ তাদের প্রতি, যা তারা স্বহস্তে লিখেছে তজ্জন্য এবং আক্ষেপ তাদের প্রতি, তাদের উপার্জনের জন্য।' (সূরা আল বাকারা : ৭৯]

সুতরাং কোন আল্লাহ্ওয়ালা আলেম কিংবা আধ্যাত্মিক ধর্মীয় গুরুকে শুভাকাঙ্খী বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে তার মধ্যে অবশ্যই নিম্নের আলামতসমূহ বিদ্যমান আছে কি-না তা যাচাই করে নেয়াটা ঈমানের দাবী–

১. তিনি কুরআন কিংবা হাদীস হিফ্যকারী হওয়াটা শর্ত নয় তবে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ্র গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান তার মাঝে থাকতে হবে।

২. তিনি আ'মল ও আক্বীদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশের ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সুন্নতের শতভাগ অনুসরণ করতে সক্ষম না হলেও বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করতে পারবেন না।

৩. তিনি দুনিয়াবী সম্মান, পরিচিতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, খ্যাতি, অধিক ধন-সম্পদ প্রভৃতির আকাঙ্খা করবেন না।

৪. পরিমিত আহার, পরিমিত ঘুম, স্বল্পভাষী, অধিক সালাত আদায়কারী, সামর্থানুযায়ী দান-খয়রাতকারী, অল্পে তুষ্ট, লজ্জাশীলতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলী তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে।

৫. তিনি পরিহার করে চলবেন– অহংকার, বখিলতা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও বিদআ'ত।

মূলত আল্লাহ্ পাক চাহেন তাঁর মুসলমান বান্দাগণ সত্যপন্থীদের সাথে থাকুক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা কতইনা চমৎকার–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (সূরা আত তাওবাহ : ১১৯)

কিয়ামত দিবসে যাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকবে এবং উপকারে আসবে তারাই প্রকৃত বন্ধু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন–

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

'বন্ধুরা সেদিন (কিয়ামত দিবসে) একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, শুধুমাত্র মুত্তাকীরা (আল্লাহ্‌ভীরুগণ) ব্যতীত।' (সূরা যুখরুফ : ৬৭)

অর্থাৎ তাক্বওয়া অবলম্বনকারী মুসলমানগণের পারস্পরিক বন্ধুত্ব কিয়ামত দিবসেও টিকে থাকবে। এক কথায়, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সকল আদেশ-নিষেধ নিঃশঙ্কোচে নির্দ্বিধায় মেনে চলেছে তাদের তাদের মাঝে যদি কোন বন্ধুত্ব থেকে থাকে তবে সেই বন্ধুত্বের বন্ধন কিয়ামতের দিনও টুট্‌বে না অথচ অপরাপর সকলের বন্ধুত্ব সেদিন পারস্পরিক শত্রুতায় রূপ নিবে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে মুসলমানের বন্ধুদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। এখন এটা জানাও জরুরী যে, আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত বন্ধুত্বের শ্রেণীসমূহের বাইরে অপর কোন শ্রেণী বা দল, ব্যক্তি বা

সম্প্রদায় মুসলমানগণের বন্ধু হওয়ার যোগ্য কি-না? কুরআনুল কারীমের বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা মুসলমানদেরকে কতিপয় চিহ্নিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এ নির্দেশের ব্যতিক্রম করবে আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না এবং তারা যালিম (যুলুমকারী) হিসেবে চিহ্নিত হবেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

'আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাতো যালিম (যুলুমকারী)।' (সূরা আল মুম্তাহিনা : ৯)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

'মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত (অবিশ্বাসী) কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।' (সূরা আল ইমরান : ২৮)

যারা পরিচয়ে মুসলমান এবং মুসলমান সমাজে বসবাস করেন, মুসলমান স্বজন-পরিজনের সাথে বাহ্যিক সুসম্পর্ক এবং সদ্ভাব বজায় রেখে

চলেন অথচ গোপনে অমুসলিম কাফির-মুশরিকদের সাথে সখ্য (বন্ধুত্ব) গড়ে তোলেন তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ

عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

'সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যারা মুসলমানদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ সমস্ত সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই জন্য।' (সূরা আন নিসা : ১৩৮-১৩৯)

আরও ইরশাদ হচ্ছে–

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن

سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾

'আপনি তাদের অনেককে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম, যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ চিরস্থায়ী হবে। (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের বিরোধীতা করে কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কাহ্হার (মহা-শাস্তিদাতা) নামের রূপটি অবলোকন করতে হবে কিয়ামত দিবসে। আল্লাহ্ পাক অমুসলিমদের বন্ধুত্ব গ্রহণ সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁর হিদায়াতকামী বান্দাদের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ পাক বলেন–

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫১)

অর্থাৎ যতই সততা, সভ্যতা আর মানবতার সুর তাদের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ুক না কেন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কখনোই মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু হবে না। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কদাচিৎ তাদেরকে বন্ধুর ভূমিকায় দেখা যায়, তাও অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, ভবিষ্যতের কোন বিষবৃক্ষের আশায় তারা বর্তমান চারা গাছ দান করেছেন। আমাদের এ ধারণাকে আরো দৃঢ় করেছে আল্লাহ্ পাকের এই বাণী—

۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

'অবশ্য মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে ...।' (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮২)

আরও ইরশাদ হচ্ছে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

'হে মুসলমানগণ! আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে (ধর্মকে) উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্কে ভয় কর।' (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫৭)

অর্থাৎ প্রকৃত হিতাকাঙ্খীতো নয়ই বরং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরোধীতায় সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী। তারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে উপহাস ও বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনা। সুতরাং সর্বাবস্থায় মুসলমানদেরকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট : ইবলিশ (শয়তান) হযরত আদম ﴾عليه السلام﴿-এর একান্ত আপন হয়ে, নিজেকে একমাত্র বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করে তাঁর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের (!) চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অতঃপর বন্ধুর মন গলাতে শুরু করেছিলেন প্রাণঢালা কান্না। হযরত আদম ﴾عليه السلام﴿ও প্রথম পর্যায়ে সরল বিশ্বাসে ইবলিশকে প্রকৃত বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে নকল বন্ধু ইবলিশের শঠতা ও প্রতারণা বুঝতে পেরে প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি নিজের অনিচ্ছাকৃত ভুল স্বীকার করে তাঁর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে পূর্বের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

সুতরাং আদি পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমাদেরও আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বন্ধুত্বতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা শঠ-প্রতারক শত্রুতাকারীদের চিনে নেয়া একান্ত কর্তব্য। আমাদের উচিত নকল বন্ধুদের পরিচয় চিহ্নিত করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং প্রকৃত বন্ধুদের পরিচয় জেনে তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা। কারণ সঠিক বন্ধু নির্বাচন করতে না পারলে কিয়ামত দিবসে শুধু অনুশোচনাই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে–

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

'যালিম ব্যক্তি সেদিন (কিয়ামত দিবসে) নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতাম; হায় দুর্ভাগ্য আমার; আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!' (সূরা আল ফুরকান : ২৭-২৮)

সুতরাং আমাদের উচিত হবে বিগত দিনগুলোর যাবতীয় ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে প্রকৃত বন্ধুর সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﴾ﷺ﴿-এর প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের (সরল-সহজ পথ) দিকে এগিয়ে যাওয়া। এতে যেমন নিজ নিজ জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও সার্থক, পাশাপাশি সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব সমাজেও বয়ে যাবে অনুপম সুখ-সমৃদ্ধি আর শান্তি-শৃঙ্খলার অফুরন্ত বারিধারা।

পরিশেষে আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালার বাণীর মাধ্যমে লেখার ইতি টানছি। ইরশাদ হচ্ছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্ত্বকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা আল বাকারা : ২০৮)

মনে রেখ, শীর্ষে আরোহণের জন্য কোন না কোন অবলম্বনের অবশ্য প্রয়োজন হয়। ভুলে যেওনা, পতনের জন্য কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। –আকিক

রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

'তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং যে নূর (কুরআন) আমি সৃষ্টি করেছি সেই নূরের (কুরআনের) উপর।' [সূরা আত্‌ তাগাবুন : ৮]। ইমামুল মুরসালীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীয়্যিন আখেরী রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর নবুওয়ত ও রিসালাত যেহেতু পবিত্র কুরআনুল করীমের সুস্পষ্ট আয়াত, সহীহ্‌ হাদীসে রাসূল এবং প্রকাশ্য ও জাজ্বল্যমান মু'জিযাসমূহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, সেহেতু তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি যেসব হুকুম-আহ্‌কাম নিয়ে এসেছেন সেসব হুকুম-আহ্‌কাম ও যাবতীয় বিষয়াবলীকে সত্য বলে স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয ও একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইয্‌যত কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন– '[হে মুহাম্মদ (ﷺ)!] আপনি ঘোষণা করে দিন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সমস্ত আসমান-যমীন যাঁর অধীন, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই শক্তি দান করেন। অতএব, (তোমরা) আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর উম্মী নবীর উপর ঈমান আন, যিনি ঈমান এনেছেন আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের উপর। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।' [সূরা আল আরাফ : ১৫৮]

অর্থাৎ আমাদের ঈমান তখনই দৃঢ় হবে, সহীহ্‌ হবে এবং গ্রহণযোগ্য হবে, যখন আল্লাহ্‌ তায়ালার উপর ঈমান আনার পাশাপাশি তাঁর প্রিয় হাবীব, উম্মতের কাণ্ডারী, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপরও ঈমান আনবো এবং তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করবো। এ থেকে কোন একটি কম-বেশী হলে সে ঈমান মহাবিচারক আল্লাহ্‌র নিকট ঈমান বলেই গণ্য হবে না। যারা নবী করীম (ﷺ)-এর উপর ঈমান আনবে না, তাদের প্রতি কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে– 'যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ (ﷺ))-এর উপর ঈমান আনবে না, আমি (সে) কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।' (সূরা আল ফাত্‌হ : ১৩)

উল্লিখিত আয়াতটিতে এ কথাই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর ঈমান আনা ফরয। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ঈমান আনা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিও ঈমান হিসেবে গণ্য হবে না। আর তাই রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান না আনা ব্যক্তি কাফির হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং এরূপ ব্যক্তির জন্যই উল্লিখিত আয়াতে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) প্রতি ঈমান আনেনি, তারা যদি বংশগতভাবে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে, মুসলিম নাম রাখে এবং সরকারী কাগজপত্রে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করে থাকে, তবুও তারা কাফির হিসেবেই পরিগণিত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন– নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, 'আমাকে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে আদেশ করা হয়েছে যে, মানুষ যে পর্যন্ত সাক্ষ্য না দিবে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং যে পর্যন্ত আমার প্রতি ঈমান না আনবে, নামায না পড়বে, যাকাত আদায় না করবে, সে পর্যন্ত আমি যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি। আর যখন তারা এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি এগুলো পাওনা হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। (যেমন : বিনা কারণে কতল করা, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করা প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি)। আর তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্ পাক নিবেন।' [সহীহ্ মুসলিম, বুখারী]। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র সকল গ্রন্থে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী করীম (ﷺ) বলেছেন– 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকার জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা যখন এই সাক্ষ্য দিবে, তখন আমার হাত (যুদ্ধ) থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে।' (শরহে শিফা)

সুতরাং রাসূলের সহীহ্ হাদীস দ্বারাও এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উপর ঈমান আনা ব্যতীত আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন গ্রহণযোগ্য নয় কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীয়্যিন, রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)কে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে স্বীকার

করে না, সে তো তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআন ও শরীয়তের যাবতীয় আহ্কামকেও স্বীকার করে না। তাই এরূপ ব্যক্তি সর্বাবস্থায়ই কাফির ও যিন্দিক হিসেবে গণ্য হবে। এই সকল কাফির-যিন্দিকের উদ্দেশ্যে হযরত আবু হুরায়রা (﵁) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন– 'সেই পবিত্র মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যদি কেউ চাই সে ইয়াহুদী হোক কিংবা নাসারা– আমার রিসালাতের (রাসূল হবার) সংবাদ শুনে অতঃপর আমার প্রতি এবং প্রেরিত শরীয়তের প্রতি ঈমান না এনে মারা যায়, সে নির্ঘাত জাহান্নামী হবে।' [মিশকাত শরীফ]। অর্থাৎ রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) নবুওয়ত ও রিসালাতের উপর ঈমান আনা ফরয ও জরুরী। আর হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আনীত শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন শরীয়ত কস্মিনকালেও কারো জন্য কোন প্রকারে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আলোচিত কুরআন-হাদীসের বাণী থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) উপর ঈমান আনা ফরয। এবং এর অন্যথা হলে প্রস্তুত রয়েছে জাহান্নামের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি । তবে একটি কথা সর্বাগ্রে জানা থাকা প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালার পর রাসূলুল্লাহ্র (ﷺ) উপর ঈমান আনা ফরয– এর অর্থ কি? অনেক অতি বুঝনেওয়ালাগণ অবশ্য বলে থাকেন যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালার পাশাপাশি নবী করীম (ﷺ) এর উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে- আমাদের চাওয়া-পাওয়া, বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত প্রভৃতিতে আল্লাহ্ যেমন সাহায্য করে থাকেন, ঠিক তদরূপ রাসূল মুহাম্মদও (ﷺ) সাহায্য করতে সক্ষম (নাউযুবিল্লাহ!)। আবার রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর উপর ঈমান কারো এতো মযবুত যে, তারা ফরয তরক করে কেবল মাত্র সুন্নতের নামে মিলাদ নিয়েই মেতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে উভয়ই কুফ্র ও বেঈমানের লক্ষণ, এগুলো কোন ঈমানদারের কথা ও কাজ হতে পারে না। মূলত আল্লাহ্র রাসূলের (ﷺ) প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে– মানুষ তাঁকে এবং তাঁর নবুওয়ত ও রিসালাতকে এই মর্মে সত্য ও অকাট্য বলে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে মাখলুকের প্রতি নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেই সঙ্গে তিনি যে শরীয়ত তথা ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়ে আগমন করেছেন সেসব সম্পর্কেও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং এও বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি যে সকল আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করেছেন

সবই হক্ব ও সত্য। তবে শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে কিংবা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করলেই তাকে ঈমান বলা যাবে না, এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য আন্তরিক বিশ্বাসের পাশাপাশি এগুলো পালনের ব্যাপারে দৃঢ় ও অটল সংকল্প একান্ত জরুরী ও অপরিহার্য। কারণ কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে– 'এইসব লোকেরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি; (হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন যে, তোমরা ঈমানতো আনোইনি বরং বলো যে, আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং তোমাদের অন্তরে এখন পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের আমলসমূহ থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরম দয়ালু, মহাক্ষমাশীল। পূর্ণ মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে; অতঃপর এত কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে। মুলত তারাই সত্যনিষ্ঠ্য।' (সূরা আল হুজুরাত : ১৪-১৫)

অর্থাৎ যদি সামান্যতম শোবা-সন্দেহও অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তবে ঈমান সহীহ্ হবে না। আর শুধুমাত্র মুখে স্বীকার বা সাক্ষ্য প্রদান করলেই ঈমান সহীহ্ হবে না বরং অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তা থাকতে হবে। কারণ শুধুমাত্র মুখে স্বীকার ও সাক্ষ্য প্রদানকে কুরআনে নিফাক তথা ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত বলেছেন– 'যখন আপনার নিকট এই মুনাফিকরা আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রাসূল। এ কথাতো আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই মুনাফিকগণ মিথ্যুক।' [সূরা মুনাফিকুন : ১]। অর্থাৎ ঐসকল লোক কসম খেয়ে রাসূল মুহাম্মদ ﷺকে আল্লাহ্র রাসূল বলে মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার দরুন তারা আল্লাহ্ পাক কর্তৃক মিথ্যাবাদী মুনাফিক সাব্যস্ত হয়েছে। আর আখিরাতে মুনাফিকগণের শাস্তি কাফিরদের চেয়েও জঘন্য ও ভয়াবহ হবে। আল্লাহ্ পাক এদের শাস্তি সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন– 'নিঃসন্দেহে মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং আপনি কখনো তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না।' (সুরা আন নিসা : ১৪৫)

অতএব, রাসূল মুহাম্মদের ﷺ উপর ঈমান আনা তখনই সহীহ্ বলে গণ্য হবে, যখন তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে মৌখিক সাক্ষ্য দেয়ার

পাশাপাশি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কুরআন ও শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানকে বিনা শোবা-সন্দেহে মেনে নেয়া হবে। ইমামুল মুরসালীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীয়্যিন রাসূল মুহাম্মদের ﴾ﷺ﴿ প্রতি সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্যরূপে ঈমান আনার পর আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল হিসেবে যে সকল শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম তিনি বর্ণনা করেছেন, সেসব বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজের উপর আমল করা। কারণ, তাঁর অনুকরণ, অনুসরণ ও আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আনুগত্য করারই নামান্তর। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা ﴾رضي الله عنها﴿ বলেছেন– 'তাঁর [রাসূল মুহাম্মদের ﴾ﷺ﴿] চরিত্র ছিল আল-কুরআন।' পবিত্র কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' [সূরা আল আনফাল ২০]। আরও ইরশাদ হয়েছে– '(হে মুহাম্মদ ﴾ﷺ﴿!) আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।' [সূরা আল ইমরান : ৩২]। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানদার হয়েছে, তাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে, রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ-নির্দেশ নত শিরে মেনে নেয়া এবং তা হতে কখনো বিচ্যুত না হওয়া। কুরআন পাকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত আরও ইরশাদ করেন– 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো আর যে বিমুখতা প্রকাশ করলো, আমি তার জন্য (হে মুহাম্মদ ﴾ﷺ﴿!) আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।' (সূরা আন নিসা : ৮০)

উল্লিখিত আয়াতটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে কাজে-কর্মে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী করীম ﴾ﷺ﴿কে অনুসরণ করে, সে মূলত আল্লাহ্‌র হুকুমকেই অনুসরণ করে। কেননা, রাসূলে আকরাম ﴾ﷺ﴿ যে সকল হুকুম আহ্‌কাম প্রচার করেছেন, তার প্রকৃত হুকুমদাতা তো স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা; আর যেহেতু ঐসকল হুকুম-আহ্‌কাম কখনও প্রত্যক্ষ ওহী (কোরআন) আবার কখনও পরোক্ষ ওহীর (সুন্নাহ্) মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়, সেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌র ﴾ﷺ﴿ আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনেরই আনুগত্য। এজন্য যারাই নিঃসঙ্কোচে, দ্বিধাহীন চিত্তে আখেরী

রাসূল, ইমামুল মুত্তাক্বীন মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাদের জন্য মহান আল্লাহ্ পাক রেখেছেন মস্তবড় পুরস্কার। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে– 'আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা ঐ সকল লোকের সঙ্গে (অর্থাৎ নবী, সিদ্দিকীন, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে) থাকবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন তারা খুবই ভাল সঙ্গী।' (সূরা আন্ নিসা : ৬৯)

তাহলে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা পরকালে আম্বিয়া (عليهم السلام), সিদ্দিকীন, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণদের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে, তাদের সান্নিধ্যে জান্নাতে ভোগ-বিলাস উপভোগ করবে। একজন ঈমানদারের জন্য এর চেছে বড় নিয়ামত ও পুরস্কার আর কিইবা হতে পারে! মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তার প্রিয় হাবীবের আনুগত্যকারী বান্দাদের জন্য আরও পুরস্কার ঘোষণা করেছেন– 'এবং তাঁর (মুহাম্মদ (ﷺ)-এর) ইত্তেবা কর, যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পার।' [সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮]। আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন– 'যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।' [সূরা আর নুর ৫৪]। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আনুগত্য করার প্রতিদানে স্বীয় মহব্বত ও মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন। কুরআন পাকে এসেছে– 'হে রাসূল (ﷺ)! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি মহব্বত রাখ, তবে আমার ইত্তেবা কর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন, তোমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল ইমরান : ৩১)

সবচেয়ে বড়কথা, বর্তমানে আমরা যে যামানায় বাস করছি, তা ফিৎনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ। এই ফিৎনা-ফাসাদের যুগে যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নাতের উপর অটল থাকতে পারি, তবে আমাদের জন্য রয়েছে আরও বিশেষ কিছু নিয়ামত যা অন্য কোন নবী-রাসূলের উম্মতগণ পায়নি। হাদীস শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন– 'ফিৎনা-ফাসাদের যামানায় আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে (এবং তদনুযায়ী আমল করবে), তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে।' [মিশকাত শরীফ]। তবে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার আমরা তখনই আশা

করতে পারি, যখন পরিপূর্ণ মু'মিন হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের কেউ (পরিপূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা আমার আনীত শরীয়তের ও আহ্‌কামের অনুসারী ও অনুগত না হবে।' [মিশ্‌কাত শরীফ]। আরও ইরশাদ করেন– 'তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট পিতা, সন্তান এবং অপরাপর সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হই।' [বুখারী শরীফ]। রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও তাঁর আনুগত্যকারী ঈমানদারগণকে আখিরাতে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে পুরস্কারপ্রাপ্ত হতে দেখে কাফির, মুনাফিক ও যালিমরা আফসোসে চিৎকার ও আর্তনাদ শুরু করে দিবে। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে– 'এ কাফির-যালিমরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার সময় চিৎকার করে বলবে : হায় আফসোস! আমরা যদি আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলতাম। হায়! আমরা যদি তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতাম!' (সূরা আল আহযাব : ৬৬)

কুরআনে অপর এক আয়াতে এসেছে– 'সেদিন যালিমরা (আফসোসে) হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! কতই না ভালো হতো, যদি আমরা (দুনিয়াতে) রাসূলের অনুগত হয়ে তাঁর দেখানো পথে চলতাম!' [সূরা আল ফুরকান : ২৭]। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকবে এবং পরিপূর্ণরূপে রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য না করবে, তার আখিরাতে শুধু আফসোস আর নিজ হাত কামড়ানো ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীয়্যিন রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত যে মহা নিয়ামত ও পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তার সম্মুখে দুনিয়াবী ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ কোন মূল্যই রাখে না। নিশ্চয়ই আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ, যা অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তির আশা করা যায়। অতএব, মহান আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনার ও আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (ﷺ)

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। অগনিত দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও হাবীব সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যার পরে কোন নবী নেই, আল্লাহ্র পরে যার সমকক্ষ কেউ নেই। আমরা আবার তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করছি যিনি বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ ইমামুল মুরছালীন, সাইয়্যেদুল মুরছালীন, খাতামুন্নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)কে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এ নশ্বর ধূলির ধরায় যত নবী-রাসূল (عليهم السلام) আগমন করেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন গোত্রীয় বা আঞ্চলিক। তাঁরা তামাম দুনিয়ার হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হননি। আর নবীয়ে রহমত রাসূলে আকরাম (ﷺ) ছিলেন বিশ্বনবী। বিশ্ব মানবতার হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য তিনি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমন ছিল বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত স্বরূপ। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেন– 'হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।'(সূরা আম্বিয়া :১০৭)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন– 'আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (সূরা সাবা : ২৮)

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)কে শুধুমাত্র মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেননি, তাদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপেও প্রেরণ করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যেক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কওম ও গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন আমাদের নবী করীম (ﷺ) সেক্ষেত্রে সমগ্র মানব জাতির জন্য গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে এককভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর এখানেই অপরাপর সকল নবী-রাসূল থেকে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক হবে এটাই স্বাভাবিক। মহান

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন– 'এই রাসূলগণ, তাদের কাউকে অন্য কারও উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (সূরা আল বাকারা : ২৫৩)

পূর্ববর্তী প্রেরিত নবী-রাসূলগণ হতে নিজ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্পর্কে হযরত জাবির ﴾رضي الله عنه﴿ বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম ﴾ﷺ﴿ ইরশাদ করেন– 'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। সেগুলো হচ্ছে : ১. আমাকে ভয় ও ভীতির মাধ্যমে বিজয় ও পর্যাপ্ত সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। ২. আমার জন্য সমগ্র ভূ-খণ্ডকে সিজদার উপযুক্ত করা হয়েছে। ৩. যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কারো জন্য হালাল ছিলো না। ৪. আমাকে শাফাআ'তের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ৫. আমার পূর্ববর্তী নবীগণকে ﴾عليهم السلام﴿ নির্দিষ্ট কওম বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল; কিন্তু আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র জাহানের জন্য।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ শরীফ)

হযরত আবু হুরায়রা ﴾رضي الله عنه﴿ বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী করীম ﴾ﷺ﴿ ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ্ পাক এর পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে : ১. আমাকে জাওয়ামিউল কালিম- এর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ২. আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য মসজিদ বানানো হয়েছে। ৫. আমাকে সকলের প্রতি বিশ্বনবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ৬. আম্বিয়াদের ﴾عليهم السلام﴿ ক্রমধারা আমার মাঝে এসে শেষ হয়েছে।' (সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ বুখারী, নাসাঈ শরীফ)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত রাসূলে আকরাম ﴾ﷺ﴿-এর মাঝে এমন এক প্রভাবশীলতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যখন কোন রাস্তা দিয়ে গমন করতেন তখন পাপাচারী, অপরাধীর দল সহজেই আনুগত্য ও দৈন্যতা প্রকাশ করতো এবং নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হতো। এমন অনেক হাদীস আছে যেখানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﴾ﷺ﴿ বলেছেন– 'আমাকে বিজয়, সাহায্য, ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের উপকরণাদি দান করা হয়েছে। এমনকি আমার প্রভাব একমাসের দূরত্ব পর্যন্তও সক্রিয় আছে।' (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, মুসনাদে আহ্মদ, বায়হাকী, বায্যার)

কালামে পাকে মহান আল্লাহ্ জাল্লা ওয়া বারাকা ইরশাদ করেন– 'অতি সত্তর আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভয়-ভীতি ঢেলে দিব।' (সূরা আল আনফাল : ১২)

তিনি আরও ইরশাদ করেন– 'অতঃপর আল্লাহ্ পাক অন্তরসমূহে ভয়-ভীতি ঢেলে দিলেন।' (সূরা আল আহ্যাব : ২৬, সূরা হাশর : ২)

মহান আল্লাহ্ পাকের উপরোক্ত আয়াত সমূহের কার্যকারীতা বহু পূর্বেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। কারণ এমন অনেক কাফের মুশরিক বীর বাহাদুরী মাখা কোষমুক্ত তরবারী হাতে রাসূলুল্লাহ্র (ﷺ) শির মোবারক বিচ্ছিন্ন করার খাহেশে আঘাত করার বৃথা চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু যখনই তাদের দৃষ্টি নবীজীর (ﷺ) নূরানী চেহারা মোবারকে পতিত হয়েছে তখনই তারা ভীত কম্পিতভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক বড় বড় সন্ত্রাসী গোত্রের লোকজন তাঁর নাম মোবারক শ্রবণ করেই নিস্প্রভ ও নিস্ত ব্ধ হয়ে যেত। মদীনার উপকণ্ঠে বিত্তবৈভবে পূর্ণ ইয়াহুদীরা খায়বরের দূর্ভেদ্য দূর্গে বসে স্বীয় রাজ্য পরিচালনা করছিল। তাদের অহংকার ছিল স্বীয় সমরাস্ত্র ও ফৌজি শক্তির উপর। অন্যান্য কাফেরদের চেয়ে তারা ছিল আরও বেশী শক্তিশালী ও মজবুত। কিন্তু রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অকস্মাৎ এক প্রভাতে তিনশত মুসলিম সৈন্য খায়বরের দূর্গগুলোর সম্মুখে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হলো এবং তাদের আতঙ্কগ্রস্ত মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসতে থাকলো এ যে মুহাম্মদের (ﷺ) সৈন্য বাহিনী! আরেকবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁকে দর্শন মাত্রই ভয়ে কাঁপতে লাগলো। নবী করীম (ﷺ) তাকে বললেন– 'ভয় করোনা। আমি বাদশাহ্ নই। আমিতো একজন কুরাইশ মাতার সন্তান, যিনি শুকনো গোশ্ত ভক্ষণ করতেন।' (শামায়েলে তিরমিযি)

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য যে স্থলে চার দেয়ালের বাইরে উপাস্য লাভের কোন উপায় নেই, মুসলমানদের জন্য সে স্থলে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠই ইবাদতগাহ্ হিসেবে পরিগণিত। উঁচু-নীচু, সমতলভূমি, শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমি, বন-প্রান্তর, পাহাড়-পর্বতের সুউচ্চ চূড়া, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, বাসস্থান কিংবা মসজিদ, মুসলমানগণ সবখানেই নামায আদায় করতে

পারেন। রহমতে আলম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আমার জন্য সমগ্র বিশ্বজাহানকে সিজদার স্থল নির্ধরণ করা হয়েছে।' [সহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযি]। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেখানে চার দেয়ালে ঘেরা উপাসনালয় ব্যতীত উপাসনা করতে পারেনা, সেখানে নবী করীম (ﷺ) ও তাঁর উম্মতের জন্য সমগ্র বিশ্বজাহানকে সিজদার স্থল নির্ধারিণ করে মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের বিশ্বজনীনতাকেই মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

সৃষ্টির শুরু থেকে রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসুল (عليهم السلام) এই দুনিয়ার বুকে আগমন করেছেন। তাদের সকলের কর্মপন্থা এবং হিদায়াতের সুনির্দিষ্ট ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ আর বিশেষ কিছু অবহিত হওয়ার উপায় নেই। এছাড়া তাদের স্মৃতিচিহ্নগুলোও ইতিহাসের অতলে হারিয়ে গেছে। তথাপিও ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় হযরত নূহ (عليه السلام) হতে ঈসা রূহুল্লাহ্ (عليه السلام) পর্যন্ত আম্বিয়াদের (عليهم السلام) মধ্যে একমাত্র হযরত মুসা (عليه السلام) ব্যতীত অপরাপর কারও অনুসারীর সংখ্যা একশতের অধিক ছিল না। আর হযরত মুসার (عليه السلام) হিদায়াতের কার্যক্রমও মাত্র কয়েক হাজার লোকদের নিয়ে চালু হয়েছিল। যাদের অনেকে আবার তাঁর মূল শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দলে দলে বেরিয়ে গিয়ে গো-বৎস পূজাসহ নানা ধরণের পথভ্রষ্ট কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছিল। হযরত ঈসা (عليه السلام) তাঁর সমৃদ্ধ মু'জিযা দ্বারা শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন অনুসারীকেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। বাকীরা একাধিকবার তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পরও তাঁকে অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেনি; উপরন্তু তাঁর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে আর ভুলে গেছে তাঁর আদর্শ ও প্রদর্শিত পথ।

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর মহিমা অপার। আরব মরুভূমির নিরক্ষর, জাহেল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে জন্ম নিলেন নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (ﷺ)। মক্কার পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে ঘোষণা করতে লাগলেন তাওহীদের বাণী। সহায় সম্বলহীন যুবক মুহাম্মদ (ﷺ) কট্টর, জাহেল বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে তাওহীদের পতাকাকে তুলে ধরলেন। দাওয়াত দিতে শুরু করলেন কালেমায়ে তাওহীদের। প্রত্যুত্তরে

পেলেন একবুক হতাশা আর গ্লানিকর কটুক্তি। কিন্তু দুই যুগ অতিবাহিত হলো না, আরব জাহানের ধূলিকণা পর্যন্ত কালেমায়ে তাওহীদের **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** জিকিরে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে বিদায়ী হজ্বের ভাষণে তাঁর ডানে-বামে সম্মুখে ছিল লক্ষাধিক প্রাণপ্রিয় সাহাবী, সত্যকামী বীর আর মরণজয়ী মুজাহিদ।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন– 'আমার নবুওয়তের সত্যতার স্বীকৃতি যে হারে দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের নবুওয়তকে এতখানি স্বাগত জানানো হয়নি। আর এমনও নবী আছেন যাদের অনুসারীর সংখ্যা একের অধিকও ছিলনা।' (সহীহ মুসলীম শরীফ)

নবী করীম (ﷺ) অন্যত্র বলেছেন– 'একবার আল্লাহ্ পাক কর্তৃক আমাকে এমন ভেদ দেখানো হয়েছে যে, আম্বিয়াগণের (عليهم السلام) মধ্যে এমনও আছেন যাদের অনুসারীর সংখ্যা দু'একের মাঝে সীমিত এবং এমনও আছেন যাদের অনুসারী মাত্র একজন। আবার এমনও আছেন যাদের বিলকুল কোন অনুসারীই নেই। এরপর আমার নজর পড়ল একদল জমায়েত লোকের উপর। আমি ধারণা করলাম এরা আমার উম্মত। এরপর আমাকে অন্যদিকে নজর করতে বলা হলো। আমি নজর করে দেখলাম এত লোকের ভীড়, তা যেন চক্রবাল জুড়ে আছে। তারপর বলা হলো অনুরূপভাবে এই দিকে চেয়ে দেখুন, আমি দেখলাম অগণিত জনতার সমাবেশ ঘটেছে সেখানে। ঠিক এমন সময় গায়েব হতে আওয়াজ আসলো এরা হচ্ছে তোমার উম্মত।' (সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী)

সুব্হানাল্লাহ্! নবীয়ে রহমত রাসূলে পাক মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর উম্মতের সংখ্যা অধিক হওয়ার মূল যে কারণ তা হচ্ছে, তাঁর পূর্বে আগমনকারী নবী-রাসূলগণ (عليهم السلام) শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কওম বা গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তাদের দাওয়াত ও হিদায়াত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্যও ছিলনা। কিন্তু ইমামুল মুত্তাকীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর নবুওয়ত ও রিসালাত দুনিয়ার সকল কওম বা সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। সাদা-কালো, বাদশাহ্-গোলাম, হাবশী, আরবীয়, আজমী, চীনা, হিন্দুস্তানী সকলেরই নবুওয়তে মুহাম্মদীর (ﷺ) মাঝে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অধিকার ছিল। যেমন- হযরত শুয়াইব রুমী

(ﷺ), হযরত বেলাল হাবশী (ﷺ), হযরত সালমান ফারসী (ﷺ) প্রমূখ সাহাবীগণ প্রত্যেকেই অনারবী ছিলেন, এরপরও ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে তারা বঞ্চিত হননি। আর উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অধিকার ও সুযোগের এই ধারা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও সচল থাকবে। কারণ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেছেন– '(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) আমি আপনাকে সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করেছি।' (সূরা সাবা ২৮)

পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের (عليه السلام) উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ– প্রচলিত তাওরাত কিতাবে শুধুমাত্র বিভিন্ন কওমের ইতিহাস ও কতিপয় হুকুম আহ্কামের সংগ্রহ দেখা যায়। মানব চরিত্রের কতিপয় মামুলি আচরণের কথা ছাড়া গূঢ় রহস্যাবলীর কথা এতে মোটেও নেই। আর প্রচলিত যবুর কিতাবে আছে কতগুলো দু'আ ও মুনাজাতের সম্ভার। প্রচলিত ইঞ্জিল কিতাবে পাওয়া যায় ঈসা (عليه السلام) এর কর্মকাণ্ড ও চরিত্র বিষয়ক কতিপয় আলোচনা, তাও আবার বিকৃত। এছাড়া বনী ইসরাঈলের নবীগণের সহীফাতে কেবল তওবাহ্, নিয়ামত এবং ভবিষ্যত বাণীর কিস্সা-কাহিনী আছে। অর্থাৎ এসব কিতাব-সহীফার কোনটিতেই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, হুকুম-আহ্কামসহ প্রয়োজনীয় সমস্যাবলীর সমাধানের দিক নির্দেশনা নেই। কিন্তু সরদারে দো'জাহান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উপর আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নাযিলকৃত যে কিতাব আল কুরআন তা পরিপূর্ণ কালেমার পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এতে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের যাবতীয় বিষয়াদি বর্ণিত আছে। এছাড়া একটি আসমানী কিতাবের পরিপূর্ণতার জন্য যা যা দরকার এর সবই আল কুরআনে বিদ্যমান আছে। এ কারণেই নবী করীম (ﷺ) আপন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন– 'আমাকে পরিপূর্ণ কালেমা প্রদান করা হয়েছে।' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার শক্তি দেয়া হয়েছে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

নবীয়ে রহমত রাসূলে পাক মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) তাঁর ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে আরাফাত ময়দানে মুসলিম মিল্লাতের এক বৃহৎ সমাবেশে ইসলামী আক্বীদাহ্ ও হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কিত আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন যা

বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত এই ভাষণে তিনি দ্বীনের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বলার মাঝপথে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ হতে নাযিল হলো– 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম আর দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।' [সূরা আল মায়িদাহ : ৩]। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ্র (ﷺ) মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এবং তাঁর উম্মতের জন্য তাঁর নিয়ামতকেও পূর্ণ করে দিয়েছেন। মূলত ইসলাম এমন একটি দ্বীন যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছিল। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের ভিতর দিয়ে তা পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়। এবং আল্লাহ্ পাক একে পরিপূর্ণতা দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে অনুগ্রহ করেন। আর এখানেই পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ (عليهم السلام) থেকে নবী করীম (ﷺ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলে আকরাম (ﷺ) তাঁর সঙ্গে পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের (عليهم السلام) স্বাতন্ত্র্যতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন– 'আমার এবং অন্যান্য আম্বিয়াগণের তুলনামূলক ব্যবধান হচ্ছে এরূপ : এক ব্যক্তি একটি সুসজ্জিত ইমারত নির্মণ করল। কিন্তু এর এক কোনে একটি ইটের স্থান খালি রেখে দিল। লোকজন এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর বৈচিত্র দেখে বিস্ময় বোধ করল। তবে তারা এটাও প্রত্যক্ষ করল যে, এক কোনে একটি ইটের স্থান খালি আছে। এটি দেখে তারা পরিতাপ করে বলতে লাগল যে, একটি মাত্র ইটের স্থান কেন খালি রাখা হলো? এমতাবস্থায় আমিই হলাম সেই সর্বশেষ ইট সদৃশ। আর আমিই সর্বশেষ নবী।' (সহীহ্ বুখারী মুসলিম ও তিরমিযি)

হাদীসটিতে বর্ণিত ইমারতটি হচ্ছে দ্বীন ও নবুওয়ত। আর এর প্রত্যেকটি ইট হচ্ছে এক একজন নবী (عليهم السلام)। এই ইমারতের পরিপূর্ণতার সর্বশেষ ইটটি ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) অর্থাৎ তাঁর পবিত্র সত্তার মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং নবুওয়তের সকল দরজা (এমনকি ফাঁক-ফোকরও) বন্ধ হয়ে গেছে। যেহেতু নবীয়ে রহমত রাসূলে পাক (ﷺ)-এর মাধ্যমে দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সেহেতু নতুন কোন নবী-রাসূল আগমনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। তাই মহান

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন– 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।' (সূরা আল আহ্যাব : ৪০)

জীব মাত্রই তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর মৃত্যুর পর রয়েছে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের দিন। এ দিনে সকল নবীর (عليه السلام) উম্মতগণ এক ময়দানে দণ্ডায়মান হবে বিচারের প্রতীক্ষায়। পাপী-গুনাহ্গার উম্মতগণ কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। তারা শুধু সাহায্যের আশায় দিগ্-বিদিক্ ছুটতে থাকবে। তারা তাদের উপর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের (عليه السلام) নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হবে; কিন্তু সবাই তাদের ফিরিয়ে দিবে এই বলে যে, তোমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করার ক্ষমতা কিংবা যোগ্যতা এর কোনটাই আজ আমাদের নেই। আল্লাহ্ পাক আজ যে রুদ্রভাব ধারণ করেছেন তা না পূর্বে কখনো ছিল আর না এমনটা হবে কখনও। তাই আজ ইয়া নাফ্সী, ইয়া নাফ্সী বলা ছাড়া আমরা আর কোন গত্যন্তর দেখছি না। সকল নবী-রাসূল (عليه السلام) যখন তাদের কওম ও অন্য সকল লোকদের অত্যন্ত নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিবেন, ঠিক তখনই শাফিউল মুজনেবীন, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) স্বীয় শির মুবারকে শাফাআতের তাজ পরিধান করে এগিয়ে আসবেন। এগিয়ে আসবেন গুনাহ্গার পাপী বান্দাদের দস্তেগিরী করার জন্য। তিনি আসবেন আলাহ্ পাকের রহমত ও বরকতের পশ্রা নিয়ে। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই রহমত ও শাফাআতের ক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয় মর্যাদার অধিকারী। এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন– 'আমাকে অন্যান্য আম্বিয়াগণের (عليه السلام) থেকে অনেক বেশী মর্যাদা ও ফযিলত দান করা হয়েছে।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন– 'আমিই হবো সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমিই সে ব্যক্তি যার সুপারিশ সর্বাগ্রে কবুল করা হবে।' (সহীহ মুসলিম)

অন্যত্র বলেন– 'আমিই প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাতের জন্য সুপারিশ করবো।' (সহীহ মুসলিম)

নবী করীম (ﷺ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা পৃথিবীর সমস্ত কাগজ-কলম একত্র করে লিখতে বসলেও লেখা শেষ হবে না। তাই এক কথায় কলতে হচ্ছে, তিনি ছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতের অর্থাৎ উভয় জাহানের সর্দার, নেতা ও পথ প্রদর্শক। সার্বিকভাবে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের (عليهم السلام) তুলনায় তিনি ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার বিকাশস্থল। তাইতো তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেছেন– 'রোজ কিয়ামতে আমিই সকল নবী-রাসূলদের (عليهم السلام) প্রতিনিধি এবং ইমাম। আমি তাদের শাফাআতের কর্ম সুসম্পন্নকারী। কিন্তু এর জন্য কোন ফখর নেই।' [তিরমিযী]। অন্যত্র বলেছেন– 'আমি কিয়ামতের দিন সকল বনী আদমের সর্দার হব। কিন্তু এর জন্য কোন অহংকার নেই। এবং আমারই হাতে প্রশংসার ঝাণ্ডা তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্যও কোন ফখর নেই। কিয়ামতের দিন আদম (عليه السلام) ও অন্যান্য আম্বিয়াগণের (عليهم السلام) সকলেই আমার ঝাণ্ডার নীচে থাকবেন। কিন্তু এর জন্যও আমি কোন ফখর করছি না। আর কবরবাসীদের মধ্য হতে সর্বাগ্রে আমাকেই উত্থিত করা হবে। আমিই সর্বপ্রথম কবর হতে বেরিয়ে আসবো এর জন্যও কোন অহংকার নেই।' (তিরমিযি)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকেই (ﷺ) সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যও তাঁকেই (ﷺ) অনুমতি দেয়া হবে এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য কারোরই হবে না। এই যে এতো মর্যাদা, ফযিলত, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য, এর কোনটিই কিন্তু তাঁকে দাম্ভিক ও অহংকারী করে তোলেনি। মূলত এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, একজন মানুষ হিসেবে এবং একজন নবী ও রাসূল হিসেবে। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত অসীম নিয়ামত ও অগণিত গুণে গুণান্বিত হয়েও যিনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন নি তিনিতো আর কেউ নন, তিনি নবীকুল শিরোমনি, শ্রেষ্ঠ নবী, নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (ﷺ)।

আল কুরআনে রাসূল মুহাম্মদ ﴿ﷺ﴾

দয়াময় মায়াময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু। যাবতীয় প্রশংসা যাঁর তরে নিবেদিত। অগণিত সালাত ও সালাম মহামহিম হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের প্রতি। অতঃপর বক্তব্য এই যে, মহান আল্লাহ্ বারী তায়ালা বলেন–

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন।' (সূরা আল ফাত্‌হ:৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

'ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। মূলত তারাই সত্যনিষ্ঠ্য।' (সূরা আল হুজুরাত:১৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; আর তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করো না।' (সূরা মুহাম্মদ ৩৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর রাসূল মুহাম্মদের ﴿ﷺ﴾ প্রতি ঈমান আনতে হবে। এবং সে ঈমান অবশ্যই পরিপূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﴿ﷺ﴾ প্রতি ঈমান আনার পর, আল্লাহ পাকের পাশাপাশি তাঁর রাসূলেরও ﴿ﷺ﴾ আনুগত্য করতে হবে। তবে রাসূলে আকরাম ﴿ﷺ﴾-এর পরিপূর্ণ এতায়াত, আনুগত্য ও অনুসরণের পূর্বশর্তই হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও সু-ধারণা পোষণ করা এবং তাঁকে মানতে গিয়ে কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত না করা। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﴿رضي الله عنه﴾ বর্ণিত একখানা হাদীসে নবী করীম ﴿ﷺ﴾ ইরশাদ করেছেন– 'আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বা মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা অতিরঞ্জিত করবে না, যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা

ইবনে মারইয়াম সম্বন্ধে করেছে। আমিতো এক বান্দা মাত্র! তাই বলো– [মুহাম্মদ] আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।' [ইবনে আব্বাস (ﷺ) হাদীসটি হযরত উমর (ﷺ)-কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছেন; বুখারী, মুসলিম]। অর্থাৎ, খৃষ্টানরা যেরূপ হযরত ঈসা (ﷺ) সম্পর্কে সীমাহীন বাড়াবাড়ি আর ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার কারণে আল্লাহ্ পাকের রোষানলে পতিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক কর্তৃক কাফির ও মুশরিক সাব্যস্ত হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ব্যাপারে মুসলমানদেরকেও তদনরূপ অসত্য ও অতিরঞ্জিত প্রশংসার দ্বারা সীমালঙ্ঘন করা হতে বিরত থাকতে হবে। এক কথায় রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) মোবারক জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে এমন কোনো বিশ্বাস পোষণ ও প্রচার করা জায়িয নয় যা তাঁর প্রকৃত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে, তাঁর সম্পর্কে মানুষের মনে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়, সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে যা সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হতে পারে। কুরআনুল কারীমে রাসূলে আকরাম (ﷺ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মা'ছুম (নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক) ছিলেন। শুধুমাত্র নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে নয় বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হতেই তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। যেহেতু তিনিই ছিলেন আল্লাহ্ পাক কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল সেহেতু আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফাকে (ﷺ) জন্মক্ষণ হতে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিঞ্চিত সময়ের জন্যও কোনো গুনাহ্‌র কাজে জড়িত হতে দেননি। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ পাকের 'ইস্‌মত' (পাপমুক্ত অবস্থা) সংরক্ষণ মুহূর্তের জন্যেও হারিয়ে যায়নি বরং তা দৃঢ় হতে আরও অধিকতর দৃঢ় হয়েছে। এজন্যই স্বয়ং আল্লাহ্ বারী তায়ালা কুরআনুল কারীমে বিভন্ন আয়াতে উদাত্তভাবে ঘোষণা করছেন–

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾

'তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ (ﷺ)) পথভ্রষ্ট হননি, এমনকি গোমরাহ্ও হননি।' (সূরা আন নাজম : ২)

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

'এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা (অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ) আমার নির্বাচিত সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা সা'দ : ৪৭)

আল্লাহ্ পাক আরও ঘোষণা করেন–

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

'(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত-ই; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না এবং তোমার কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি আসমানী কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি আগে জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুনা অসীম।' (সূরা আন নিসা : ১১৩)

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

'নিশ্চয়ই আমার প্রিয় বান্দাদের উপর শয়তানের কোনই অধিকার নেই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৫)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর নবুওয়ত ও নিষ্পাপত্ব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কারণ, তিনি সর্বদাই মহান আল্লাহ্ পাকের হিফাজতে ছিলেন। মহান আল্লাহ্ পাকের এই হিফাজত নিদ্রায়-জাগরণে কোনো সময় এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। আর এটিই উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত মত বা ইজ্‌মা।

রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) মানুষ ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন রক্ত-মাংসের দেহধারী একজন মানুষ। তবে এ মত সম্পর্কে আজ অবধি যেমন বিভ্রান্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির সময়ও তা তেমনই ছিলো। শুধু পার্থক্য এতোটুকু যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় এ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিলো কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে, আর আজ স্বয়ং উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝেই কতিপয় দল এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফিত্‌না ছড়াচ্ছে।

রাসূলে আকরামের (ﷺ) প্রতি এদের ধারণা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾

'যখন তাদের নিকট আসে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ (হিদায়াত), তখন লোকদেরকে ঈমান আনা হতে বিরত রাখে তাদের এই উক্তি– আল্লাহ্ কি একজন মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন?' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪)

وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا ﴿٧﴾

'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে যাতায়াত করে; তাঁর নিকট কোনো ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ হলো না, যে তাঁর সঙ্গে সতর্ককারীরূপে থাকতো?' (সূরা আল ফুরকান : ৭)

রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) মানুষ হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি নিরসন কল্পে কালামে পাকের অন্যত্র মহান আল্লাহ্ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন–

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

'(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) বলো, আমার প্রতিপালক পবিত্র মহান। আমিতো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।' (সূরা বনী ইসরাঈল ৯৩)

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

'বলো, আমিতো তোমাদের মতো একজন মানুষ-ই; আমার প্রতি শুধু ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্।' (সূরা আল কাহ্ফ : ১১০)

আল্লাহ্ পাক আরও ঘোষণা করেন–

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

'বলো, আমিতো তোমাদের মতো একজন মানুষ; শুধু আমার প্রতি ওহী নাযিল হয় যে, তোমার ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ্।' (সূরা হা-মীম-আসসাজদা : ৬)

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

'লোকদের নিকট এটা কি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজন মানুষের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা! কাফিররা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট জাদুকর।' (সূরা ইউনুস : ২)

রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) উম্মী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) জাগতিক বস্তুগত ধ্যান-ধারণাসমৃদ্ধ শিক্ষাগ্রহণ ও অক্ষর জ্ঞান হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কিন্তু উম্মীয়াৎ সাধারণ মানুষের জন্য ত্রুটির ও অমর্যাদার কারণ হলেও রাসূলুলল্লাহ্র (ﷺ) জন্য তা ছিলো বিশেষ গুণস্বরূপ। কারণ, উম্মী হয়েও তিনি ধারণ করেছিলেন আল-কুরআনের ন্যায় এক বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্বলিত আসমানী কিতাব; উম্মী হয়েও তিনি ছিলেন পৃথিবীর সকল শিক্ষকের শিক্ষক। এ ছাড়াও উম্মীয়াৎ ছিলো নবী করীম (ﷺ)-এর জন্য আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত এক সার্বক্ষণিক মু'জিযা ও হিকমতস্বরূপ। যারা উম্মী নবী মুহাম্মদের (ﷺ) অনুসরণ করবে তারাই সফলকাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন–

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাঁর সম্পর্কে তারা তাওরাত, ঈঞ্জীল এবং যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে লেখা দেখতে পায়... আর তারাই সফলকাম।' (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৭)

রাসূলুল্লাহ্র উম্মীয়াৎ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন–

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

'হে নবী! আপনি (কুরআন নাযিল হওয়ার) পূর্বে কোনো কিতাব পড়েননি, নিজ হাত দ্বারা কোনো কিছু লিখেনওনি। কেননা যদি আপনি তা করতেন তবে বাতিলপন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেতো।' (সূরা আল আনকাবুত : ৪৮)

নাবী আল মুক্বাফ্ফী, নাবী আল আক্বেব, নাবী আল খাতেম, নাবী আল আখির হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) হচ্ছেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্ পাক কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (ﷺ) পরে নতুন কোনো নবী ও রাসূল দুনিয়ার বুকে আগমন করবেন না। এমনকি কাদিয়ানীদের অনুর্বর ভাড়াটে মস্তিষ্কপ্রসূত তথাকথিত যিল্লি নবী, বুরুজী নবী, উম্মতী নবী, শরিয়তবিহীন নবী প্রভৃতি নিত্য-নতুন শব্দ ও ফর্মুলা উপস্থাপন করেও নবুওয়তের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ

وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং সে আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল আহ্যাব : ৪০)

নবী করীম মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে আরাফাত ময়দানে মুসলিম মিল্লাতের এক বৃহৎ সমাবেশে দ্বীন ইসলাম, ইসলামী শরীয়াহ্, ধর্মীয় আকীদাহ্ ও হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কিত এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। নবীজী (ﷺ) ভাষণের এক পর্যায়ে দ্বীনের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বলছিলেন। এমন সময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেয়া সংক্রান্ত ওহী নাযিল হলো। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ঘোষিত হলো–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চস্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায়, যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। যে পশু যজ্ঞবেদীতে যবেহ (বলি দান) করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর (তীর) দ্বরা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্র কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। *আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম আর দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।* অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমাশীল।' (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩)

যেহেতু আল্লাহ্ পাক দ্বীনকে 'শেষনবী'র আকীদাহ্ অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল' এই আকীদাহ্ প্রতিটি মুসলমানের জন্যই অনস্বীকার্য। খতমে নবুওয়তের এই আকীদাহ্কে অস্বীকার করলে কিংবা এ আকীদার প্রতি কোনো মুসলমান সন্দেহ পোষণ করলে কিংবা এ আকীদাহ্ অস্বীকারকারীকে মুসলমান গণ্য করলে কিংবা এ আকীদাহ্ অস্বীকারকারীকে কাফির গণ্য না করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমান চলে যাবে।

দুনিয়া ও আখিরাত নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। '(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) আপনি না হলে আমি আসমান যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না' কিংবা 'আপনাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কোনো

কিছুই সৃষ্টি করতেন না'। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে এবং কিছু কিছু সীরাত গ্রন্থে-প্রবন্ধে দালিলিক প্রমান (Reference) ছাড়াই এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। '*অথচ আল্লামা সাগানী, মোল্লা আলী ক্বারী, শায়খ আব্দুল হাই লাখনবী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে কথাটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই শব্দ ও বাক্য কোনো হাদীসের গ্রন্থে কোনো প্রকার সনদে বর্ণিত হয়নি।' [দেখুন হাদীসের নামে জালিয়াতি : ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর, পৃ. ২৪৭]* অনেকে আবার সনদ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে এ বাক্যটিকে হাদীসে কুদ্সী বলে উল্লেখ করে থাকেন। অথচ স্বয়ং আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারীমে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

'নিশ্চয়ই আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।' (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

وَإِنَّ لَنَا لَلْءَاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

'আর নিশ্চয়ই আখিরাত ও দুনিয়া আমারই জন্য।' (সূরা লাইল:১৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এ বিশ্বজগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই জন্য; তাঁরই ইবাদত ও গোলামী করার জন্য; তাঁর কোনো সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে নয়।

কালামে পাকে আল্লাহ্ বারী তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

'অতএব (হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান এবং আপনার রবের ইবাদত করতে থাকুন যতক্ষণ না আপনার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।' (সূরা আল হিজর : ৯৮-৯৯)

অর্থাৎ, আখেরী নবী মুহাম্মদকে ﷺ আল্লাহ্ পাক সৃষ্টিই করেছেন তাঁর বাণী দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং তাঁর ইবাদত করার জন্য। সুতরাং মহান আল্লাহ্ পাকের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং সাংঘর্ষিক

কোনো বাক্য বা বক্তব্যকে হাদীসে কুদসী হিসেবে উপস্থাপন করে রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয় ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রকৃত গায়েব জানতেন না। মহান আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে প্রিয় বান্দা হিসেবে অনুগ্রহপূর্বক যা কিছু অবলোকন করিয়েছেন এবং যে সকল বিষয়ে অবগত করেছেন তা ব্যতীত অপরাপর কোনো বিষয় বা গায়েব সম্পর্কে তিনি অবহিত নন বা ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন–

قُلْ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّىٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾

'(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) বলুন, আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। তিনি হচ্ছেন গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। অন্য কারও নিকট তা তিনি প্রকাশ করেননি। তবে, রাসূলদের মধ্যে কাউকে কাউকে খুশী হয়ে জানিয়েছেন। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাদে প্রহরী নিযুক্ত করেন যাতে আল্লাহ্ তায়ালা জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছেছিলেন কি-না। রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।' (সূরা জিন : ২৫-২৮)

মূলত গায়েব বলতে যা বুঝায় তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই আ'লিমুল গ্বাইব। এটি তাঁর একটি সিফাত। আর আল্লাহ্ পাকের সিফাতে অন্য কাউকে সহযোগী বা অংশীদার সাব্যস্ত করা শির্ক। রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) প্রকৃত গায়েব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং আল্লাহ্র এ ঘোষনা সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করছে বা বিভ্রান্তিতে আছে তাদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (ﷺ)কে আল্লাহ্ পাক নিঃসংকোচে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করতে বলেছেন–

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

'(হে মুহাম্মদ(ﷺ)!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।' (সূরা আন নমল : ৬৫)

অপর এক আয়াতে আবারও সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করতে বলেন–

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

'(হে মুহাম্মদ(ﷺ)!) বলুন, আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে। গায়েব সম্বন্ধেও আমি অবগত নই; এবং তোমাদেরকে একথাও বলিনা যে আমি ফেরেশতা; আমার প্রতি যে ওহী আসে আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?' (সূরা আল আন'আম : ৫০)

আল্লাহ্ পাক আরো ঘোষণা করতে বলেন-

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

'বলো, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে তো আমি বহুবিধ কল্যাণই লাভ করতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি কেবল মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' (সূরা আল আ'রাফ : ১৮৮)

وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

'(হে মুহাম্মদ(ﷺ)!) বলো, আমিতো তোমাদেরকে বলি না যে, আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আমার নিকট রয়েছে, একথাও বলি না যে, আমি গায়েবের খবর জানি এবং এও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর

তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হবো।' (সূরা হুদ : ৩১)

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) সদা-সর্বদা সর্বত্র হাযির-নাযির নন। একমাত্র মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সদা-সর্বদা-সর্বত্র হাযির-নাযির। এটি একমাত্র তাঁরই সিফাত। তাঁর এই সিফাতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শির্ক। এ প্রসঙ্গে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

'...আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।' (সূরা কাফ : ১৬)

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

'তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাওনা কেন সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল বাক্বারা : ১১৫)

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। একমাত্র তিনিই জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু পতিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা জানেন।' (সূরা আল হাদীদ : ৪)

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) ছিলেন বিশ্বনবী। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ (عليهم السلام) যেমন বিশেষ একটি গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ও দেশের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি তদ্রূপ না হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-দেশ নির্বিশেষে সকলের জন্য

প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে সমগ্র বিশ্ব মানবতার হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাই একথা বলা তাঁর শানে বেয়াদবী হবে যে, তিনি শুধুমাত্র মুসলমান ও ইসলাম ধর্মানুসারীদেরই জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি একমাত্র মুসলমানদেরই নবী ও রাসূল। রাসূলে আকরাম (ﷺ) গোটা মানবজাতির জন্যই রহমত ও সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছেন। নবী করীম (ﷺ)-এর সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীতার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক কুরআনের একাধিক স্থানে ঘোষণা দিয়েছেন–

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ
مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) আমিতো আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্যই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই যথেষ্ট–সববিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।' (সূরা আন নিসা : ৭৯)

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

'আমিতো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল আম্বিয়া : ১০৭)

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

'আমিতো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (সূরা সাবা ২৮)

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

'কতো মহান তিনি (আল্লাহ্) যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।' (সূরা আল ফুরকান ১)

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾
وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

‘তিনিই (আল্লাহ্) উম্মীদের মধ্য হতে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন ...এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যও যারা এখনও (ভূমিষ্ঠ হয়নি এবং) তাদের (উম্মীদের) সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা আল জুমু’আ : ২-৩)

বিশ্ব মানবতার হিদায়াত ও কল্যাণের বাণী সম্বলিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রচিত নয়। তিনি অন্য কারো সহযোগিতায়ও এই কুরআন রচনা করিয়ে নেননি। বরং আল্লাহ্ পাক হযরত জিবরাইল (عليه السلام) মারফত ওহীর মাধ্যমে তিল তিল করে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতার সাথে এই আসমানী কিতাব তাঁর রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) উপর নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

‘(হে মুহাম্মদ (ﷺ)!) আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে।’ (সূরা দাহর : ২৩)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ ﴿٣﴾

‘আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি; ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন অবতীর্ণ করে।’ (সূরা ইউসুফ : ৩)

কুরআন যদি আসমানী কিতাব হয়ে থাকে তবে পূর্ণাঙ্গ কুরআন একবারে নাযিল হলো না কেন? সন্দেহবাদীদের এ অবান্তর প্রশ্নের জবাবে কালামুল্লাহ্তে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَـٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

‘(মুহাম্মদ (ﷺ)কে উদ্দেশ্য করে) কাফিররা বলে, সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? (জবাবে আল্লাহ্ পাক বলেন,) এভাবে আমি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য আর তাই তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।’ (সূরা আল ফুরকান : ৩২)

দীর্ঘ ২২ বৎসর ৫ মাস ১৪ দিন সময় লেগেছে পরিপূর্ণ কুরআন অবতীর্ন হতে। আর এতেই কাফির ও সন্দেহবাদীরা বলতে থাকে এত দীর্ঘ সময় ধরে মুহাম্মদ নিজেই কুরআন রচনা করেছে। অবিশ্বাসীদের এহেন আচরণে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং চ্যালেঞ্জ (Challenge) ছুড়ে দিলেন–

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

'তবে কি তারা বলে, এটি সে নিজে রচনা করেছে? বরং এটি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আগত সত্য যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।' (সূরা আস্ সাজদা : ৩)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٨﴾

'তবে কি তারা বলে সে নিজে এটি উদ্ভাবন করেছে? (হে মুহাম্মদ ﷺ!) বলো যদি আমি নিজে এটি উদ্ভাবন করে থাকি তবে তোমরাতো আল্লাহ্র শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না।' (সূরা আল আহ্ফাক : ৮)

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

'তারা কি বলে এই কুরআন তাঁর নিজের রচনা? বরং তারা মিথ্যাবাদী। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।' (সূরা আত্ তুর : ৩৩-৩৪)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

'তারা কি বলে তুমি নিজে এটি (কুরআন) রচনা করেছ? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা এনে দেখাও।' (সূরা হুদ : ১৩)

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾

'তারা কি বলে যে, এটি (কুরআন) রচনা করেছ? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা এনে দেখাও।' (সূরা ইউনুস : ৩৮)

সুব্হানাল্লাহ্! আল্লাহ্ পাকের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত কোন মাখলুক অদ্যবধি পাওয়া যায়নি, যাবেও না কিয়ামত পর্যন্ত ইন্শাল্লাহ্।

পরিশিষ্ট : মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা ওয়া বারাকা তাঁর হাবীব রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা, আহ্মাদ মুজতবা (ﷺ)কে যে সীমাহীন উচ্চ মর্যাদা ও মর্তবা দান করেছেন তা আল কুরআনের পাতায় পাতায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে এবং হাদীস শরীফে তা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এসবই আমাদের মতো শেষ জামানার উম্মতদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং অতি ভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁর মর্যাদা ও মর্তবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট আয়াত ও ঘোষণাকে অস্বীকার করে, বিকৃত করে, ভ্রান্ত তাফসীর করে, জাল-বানোয়াট ও মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় সীমালঙ্ঘনকারী হওয়া কখনো-ই ঈমানের পরিচায়ক হতে পারে না। বরং আমাদের উচিত হবে আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব রাসূল মুহাম্মদের (ﷺ) যে মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা। তাই আসুন আমরা সবাই মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থণা করি–

আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান, ওয়ার যুকনা এত্তেবায়াহু ওয়া হাব্বীবহু ইলাইনা, ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়ার যুকনা এজতিনাবাহু। ওয়া কাররিহ্হু ইলাইনা; ওয়ার যুকনা এত্তেবায়া হাদিঈ রাসূলি রাব্বিল 'আলামীন!

–হে আল্লাহ্! আমাদের হক্বকে হক্ব হিসেবেই বুঝতে দিন আর আমাদের এই তাওফিক দিন যাতে তা অনুসরণ করতে পারি। আর তা আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন। আর বাতিলকে বাতিল বলে বুঝতে দিন এবং তা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। আর তা আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করুন। আর আমাদেরকে মুহাম্মদের (ﷺ) হিদায়াত অনুসরণ করার তাওফিক দিন যিনি রাব্বুল 'আলামীনের রাসূল। আমীন ॥

উম্মী নবী ﴾ﷺ﴿

'উম্মী' (أمى) শব্দটির সহজ সরল ও বোধগম্য তরজমা হচ্ছে 'নিরক্ষর'। অর্থাৎ যে বা যিনি অক্ষর জ্ঞান মুক্ত। পবিত্র কুরআনুল কারীমে সাধারণ আরববাসীদেরকে উম্মীয়্যীন বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ পূর্বে আরব জাতির মাঝে লেখা-পড়ার প্রচলন খুব সামান্যই ছিল। তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কিন্তু কোন মানুষের জন্য সুখকর বা প্রশংসনীয় গুণ নয়, বরং তা একজন ব্যক্তির ত্রুটি হিসাবেই গণ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যত তাঁর হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফার ﴾ﷺ﴿ মাঝে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, বাগ্নিতা প্রভৃতি সহ অন্যান্য গুণাবলী বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাঁকে উম্মীত্বের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কালামুল্লাহ্য় একাধিক সংখ্যক আয়াতে নবীজীকে ﴾ﷺ﴿ 'নাবীয়্যিল উম্মী' লকবে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

'বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা নয়। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যাতে সঠিক পথ পাও।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

দো-জাহানের নয়নমণি, উম্মতের কাণ্ডারী সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র ﴾ﷺ﴿ মোবারক জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি উম্মীদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি না কখনো কোন মক্তব বা পাঠশালায় ভর্তি হয়েছেন, আর না কোন শিক্ষকের নিকট লেখা-পড়ার

উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। তিনি নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত উম্মীদের মাঝেই কাটিয়েছেন। এমনকি চলিশ বৎসর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখনও সমগ্র আরব জাহানে হাতে গোণা মাত্র ক'জন পড়তে ও লিখতে জানতো।

রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর উম্মীত্ব তথা জাগতিক বস্তুবাদ ধ্যান-ধারণাপ্রসূত শিক্ষা গ্রহণ এবং লিখতে-পড়তে জানা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ জালা শানুহু ঘোষণা করেন–

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

'(হে নবী! এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করার) পূর্বে আপনি কোন কিতাবও পড়েননি আর কোন কিছু স্বহস্তে লিখেনওনি। কেননা, যদি এরূপ হতো তবে বাতিলপন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেত।' (সূরা আল আনকাবুত : ৪৮)

উল্লিখিত আয়াতটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম (ﷺ) না কোন কিতাব পাঠ করতে পারতেন আর না কোন কিতাব স্বহস্তে লিখতে পারতেন। কুরআন পাকে আরও ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾

وَقَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾

'নবীর দাওয়াত অস্বীকারকারী লোকেরা বলে এটা (কুরআন) মিথ্যা মনগড়া জিনিস ব্যতীত কিছুই নয় ; সে (মুহাম্মদ (ﷺ)) নিজেই এটা রচনা করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে একাজে সহায়তা করেছে, (এ ব্যাপারে) ওরা অবশ্যই জুলুম ও কঠিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ওরা বলে– এগুলোতো সে কালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে আর সকাল-সন্ধ্যা এগুলো তাঁর নিকট পাঠ করা হয়।' (সূরা আল-ফুরকান : ৪-৫)

অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) যখন আল্লাহ্ পাকের নিকট হতে ওহী লাভ করার পর লোকদের সম্মুখে তা পাঠ করতে লাগলেন তখন আল-কুরআনের হিকমতপূর্ণ বলিষ্ঠ ও উচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদা সম্পন্ন কালাম শুনে

কাফির-মুশরিকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা নিজেদের মাঝে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ তো একজন উম্মী (অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান মুক্ত লোক), তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব এমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আরবী ভাষায়, উচ্চ সাহিত্যমান সম্পন্ন কালাম রচনা করা? নিশ্চয়ই অপর কোন লোকের দ্বারা সে এসব কালাম লিখিয়ে এনে (রচনা করে) তা নিজের মুখে অপরাপর লোকদের শোনাচ্ছে।

সুতরাং নবী করীম (ﷺ) যদি উম্মী না হতেন তবে ঐসব সত্য-প্রত্যাখানকারীদের এই সন্দেহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো যে, হয়তো তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ দেখে বা নকল করে সুযোগ সুবিধামত কুরআন রচনা করেছেন আর তা মুখস্ত করে লোকদের শোনাচ্ছেন (নাউযুবিল্লাহ্...)। উল্লিখিত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উম্মী হওয়া এবং আল-কুরআনের অকাট্যতা সম্পর্কে যাবতীয় শোবাহ-সন্দেহের মূলকে উৎপাটিত করে দিয়েছে। আর তাই অপর এক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্কে (ﷺ) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বলছেন—

قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

‘(হে নবী আপনি) বলে দিন! আল্লাহ্ চাইলে আমি এটি (এই কুরআন) তোমাদেরকে কখনোই শোনাতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এর খবরটুকু অবহিত করতেন না। আমিতো এর পূর্বে একটা জীবনকাল (অর্থাৎ জীবনের একাংশ) তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি। তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ কর না?’ (সূরা ইউনুস : ১৬)

অর্থাৎ, হে আরব সমাজ! তোমরাতো আমার জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আমিতো তোমাদের মাঝে তোমাদের সম্মুখেই লালিত-পালিত হয়ে এ বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি। তোমরা কি কখনও আমাকে কোন কিতাব পড়তে বা নিজ হাতে লিখতে দেখেছ? যদি না দেখে থাক তবে কেন কিভাবে কিসের উপর ভিত্তি করে তোমরা বলো যে, আমি পুরানো কিস্‌সা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করে বা করিয়ে তা আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম বলে তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি? আর এ কথাও রটিয়ে বেড়াচ্ছ

যে, অন্য সম্প্রদায়ের কোন লোক আমাকে এ কাজে সাহায্য করছে? নবী করীম ﴾ﷺ﴿-এর প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে অনেকেই তাঁর শত্রু ছিলো। অথচ তারাও কখনো এ দাবী করেনি যে, তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন কিংবা তিনি উম্মী ছিলেন না।

সাইয়্যেদুল মুরসালিন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফার ﴾ﷺ﴿ উম্মীত্ব সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত মুসলিম মনীষীর ভাষ্য নিম্নরূপ :

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﴾رضي الله عنه﴿ বলেন– 'তোমাদের নবী ﴾ﷺ﴿ উম্মী ছিলেন। লিখতে-পড়তে ও হিসাব করতে পারতেন না।' (মিফতাহুল গায়িব : চতুর্থ খণ্ড)

আলামা বায়যাবী বলেন– 'উম্মী' সে, যে লিখতেও পারেনা পড়তেও পারেনা। আর নবী করীম ﴾ﷺ﴿কে 'উম্মী' লকবে অভিহিত করার তাৎপর্য হচ্ছে, লেখা-পড়া না জানা সত্ত্বেও তিনি যে পূর্ণ মাত্রার জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন তা তাঁর একটি মু'জিযা।' (আনওয়ারুত তানযিল : তৃতীয় খণ্ড)

ইমাম কুরতুবী বলেন– 'রাসূলুল্লাহ্ ﴾ﷺ﴿ 'উম্মী' ছিলেন। 'উম্মী' উম্ম্ জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি, যে তার জন্মকালের ন্যায় লেখা-পড়া না জানা অবস্থায় আছে।'

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লেখক বলেছেন– 'কুরআনের আয়াতে রাসূলে আকরামকে ﴾ﷺ﴿ উম্মী বলা হয়েছে। কেননা তিনি লেখা-পড়া জানতেন না।'

মক্কার কাফির ও মদীনার ইহুদীরাও নবী করীমকে ﴾ﷺ﴿ উম্মী বলে বিশ্বাস করতো। তবে কাফিরদেরও কেউ কেউ নবীজীর ﴾ﷺ﴿ উম্মী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। তাদের সন্দেহের পেছনে যে ঘটনাটি দৃশ্যমান ছিল তা কতকটা এরূপ– মক্কা মুয়ায্যমায় একজন খৃস্টান দাস ছিলো। সে নিজ ভাষায় পূর্ববর্তী পবিত্র কিতাবসমূহ পাঠ করতে পারতো। নবীজী ﴾ﷺ﴿ পথ চলতে মাঝে-মধ্যে তার নিকট দাঁড়াতেন ও দেখা-সাক্ষাত করতেন। আর এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কাফিররা বলাবলি করতে লাগলো, এ খৃস্টান দাস মুহাম্মদকে কুরআনের আয়াত শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাদের এ অমূলক সন্দেহের জবাব আল্লাহ্ পাকই দিয়েছেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

'আর একথা আমার জানাই আছে যে, কাফিররা বলে, তাঁকে (মুহাম্মদকে ﷺ) শিক্ষা দেয় এক (ভিন্ন সম্প্রদায়ের) মানুষ। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষাতো আরবী নয় অর্থাৎ সে আজমী। অথচ কুরআন (ও মুহাম্মদ ﷺ)-এর ভাষা হচ্ছে আরবী ভাষা।' (সূরা আন নাহল : ১০৩)

রাসূলে আকরামের ﷺ উম্মীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী অনেকেই দলিল হিসাবে যে হাদীসটির উল্লেখ করে থাকেন:

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর মুমূর্ষু অবস্থায় ঘরে বহু লোক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ও ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'দোয়াত-কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য একটি লিখন (كتابة) লিখে দিব, যারপর তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না।' তখন হযরত উমর ﵁ বললেন– নবীজী ﷺ ব্যথার যন্ত্রনায় অস্থির; আর আমাদের নিকট কুরআন রয়েছে, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর দোয়াত-কলম এনে তাঁকে কিছু লিখতে দেয়া নিয়ে লোকদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়।' (সহীহ্ বুখারী)

হাদীসটি সহীহ্ এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু হাদীস উল্লেখকারীগণ সম্ভবতঃ নবীজীর ﷺ বক্তব্যের ভুল অর্থকে গ্রহণ করেছেন। কারণ এক্ষেত্রে তাঁর উক্ত আদেশ বা কথাতো শাসন কর্তা, রাষ্ট প্রধান, রাজা-বাদশাহ প্রভৃতি পর্যায়ের কথা ছিলো। আর ঐ সকল ব্যক্তিরাতো সাধারণত নিজেরা কিছু লিখেন না। অন্য লোকের দ্বারাই লেখান। তাই নবীজী ﷺ-এর কথা 'আমি তোমাদের জন্য একটি 'লিখন' লিখে দিব'– এর অর্থ নিশ্চয়ই এ হতে পারে না যে, তিনি নিজেই নিজের হাতে লেখাটি লিখবেন বা লিখতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যত পত্র বিভিন্ন শাসক ও কর্তা ব্যক্তিদের নিকট পাঠিয়েছেন তার কোনটিই কিন্তু নিজ হাতে লিখেননি বরং অন্যের দ্বারাই লিখিয়েছিলেন। সুতরাং সুস্থ্য অবস্থায় যেক্ষেত্রে তিনি স্বহস্তে কোন লেখা লিখেননি সেক্ষেত্রে মৃত্যুসজ্জায় শায়িত ও যন্ত্রনাকাতর অবস্থায় তিনি নিজ হাতে কিছু লিখবেন, লিখতে চাইবেন এতো চিন্তায়ও আনা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসটির ভিত্তিতে উদয় হওয়া

সন্দেহটি শুধু অমুলক ও বিভ্রান্তিকরই নয়, নবীজীর আল্লাহ্ প্রদত্ত লকব 'উম্মী' কে মিটিয়ে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্রও বটে।

কোন কোন আলিম অবশ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নবী করীম ﴿ﷺ﴾ প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে লেখা-পড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসাবে তারা হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। হাদীসটি এরূপ– হুদাবিয়ায় মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধিপত্র তৈরী হচ্ছিল। তা লিখছিলেন হযরত আলী ﴿رضي الله عنه﴾। সন্ধিপত্র লেখার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﴿ﷺ﴾ হযরত আলী ﴿رضي الله عنه﴾কে বললেন, লেখ– من محمد عبد الله ورسوله অর্থাৎ (এটি সেই সন্ধি পত্র যা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সম্পাদান করা হচ্ছে)। এতদ শ্রবণে মুশরিকরা আপত্তি উত্থাপন করলো যে, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে মেনেই নিতাম তবে তো আর এই যুদ্ধ-ফাসাদের অবতারণা হতো না। সুতরাং আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দটি আমাদের নিকট গ্রহণীয় নয় ; বরং শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ লিখুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﴿ﷺ﴾ হযরত আলী ﴿رضي الله عنه﴾কে নির্দেশ দিলেন, মুশরিকদের দাবী মোতাবেক (রাসূলুল্লাহ্) শব্দটি মিটিয়ে দিতে। কিন্তু আদবের খাতিরে হযরত আলী ﴿رضي الله عنه﴾ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার দ্বারা এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﴿ﷺ﴾ বললেন, ঠিক আছে, সেই (রাসূলুল্লাহ্ লেখা) স্থানটি দেখিয়ে দাও। হযরত আলী ﴿رضي الله عنه﴾ স্থানটিতে আঙ্গুল রেখে চিহ্নিত করে বললেন, এই খানে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﴿ﷺ﴾ নিজেই সে শব্দটি মিটিয়ে বা মুছে দিয়ে লিখলেন–

من محمد بن عبد الله অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। (সহীহ্ মুসলিম, বুখারী, মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ প্রভৃতিসহ প্রায় সকল বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ)

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﴿ﷺ﴾ নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। আর এ থেকেই উক্ত আলিমগণ বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি লিখতে জানতেন। কিন্তু আলিমগণের যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ ﴿ﷺ﴾ সত্যিই নিজ হাতে লিখেছিলেন কি-না? কিংবা এর দ্বারা তাঁর লিখতে জানা প্রমাণিত হয় কি-না? প্রশ্নের উত্তর পেতে তাই

শুরুতেই আসা যাক হাদীসটিতে উল্লিখিত সে শব্দটি চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে যা পরিবর্তন ঘটানো নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, সন্ধিপত্রে যে শব্দটি নবীজী (ﷺ) নিজে কেটে বা মুছে দিয়েছিলেন তা কিন্তু তিনি স্বয়ং চিহ্নিত করতে পারেন নি। বরং হাদীস শরীফের একাধিক বর্ণনা মতে, তিনি হযরত আলী (رضي الله عنه)কে সেই শব্দ লিখিত স্থানটি চিহ্নিত করে দিতে বলেছেন যেন নিজে তা মুছে বা কেটে দিতে পারেন। এবার আসা যাক শব্দটি মিটিয়ে দেবার পর অকুস্থলে সংশোধিত শব্দটি নবীজী (ﷺ) স্বহস্তে লিখেছিলেন কি-না সে বিষয়ে। এ প্রসঙ্গে হাফিজুল হাদীস আলামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন– হাদীসে বর্ণিত 'অতঃপর তিনি লিখলেন'– এর অর্থ হবে স্থানটি নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) নিজে তা মুছে/কেটে দিলেন অতঃপর হযরত আলী (رضي الله عنه) তা লিখলেন।

প্রখ্যাত মনীষী ইবনুত্তীনও উলিখিত ব্যাখ্যার প্রতি দৃঢ়মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন– হাদীসে বর্ণিত كتب (লিখলেন) এর অর্থ হবে امر با لكتاب (লিখতে আদেশ করলেন)। আর এক্ষেত্রে বর্ণিত 'তিনি লিখলেন' শব্দটিতো সেরকমই যেমন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে– তিনি কাইজারের নিকট লিখেছেন, কিসরার নিকট লিখেছেন; অথচ কাইজার বা কিসরা কারও নিকটই তিনি স্বহস্তে কখনোই কিছু লিখেননি।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন সীরাতকার অবশ্য বলেছেন, সর্বদা লোকেরা তাঁর নাম লিখতো। দেখতে দেখতে তিনিও নিজ নামটি লিখতে শিখে ছিলেন। এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, উক্ত ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। তবে শুধু নাম লিখতে জানলেই কারও উম্মীত্ব বিলীন হয়ে যায় না কিংবা কেবল নিজ নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কাউকে স্বাক্ষর বলা যায় না। বরং লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষর জ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) লিখতে জানতেন– বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) উম্মীত্ব ছিলো তাঁর নবুওয়ত এবং আল্লাহ্‌ পাকের নিকট থেকে ওহী পাওয়ার ব্যাপারে এক অকাট্য প্রমাণ। মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলের (ﷺ) নবুওয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি স্বহস্তে কিছু লিখতে সক্ষম ছিলেন না এবং লিখিত কোন কিছু পাঠও করতে পারতেন না। এ অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের মাঝে অতিবাহিত করেন। তিনি এ সময়কালে কোন কিতাবধারীর সাথে মেলামেশা করেননি এবং তাদের নিকট হতে কিছু শোনেননি। কারণ মক্কায় সেসময় কোন কিতাবধারীই বাস করতো না। এমতাবস্থায় চলিশ বছর পূর্ণ হবার পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন হিকমতপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জিযা আর শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালংকারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়। ঐ কালাম সমূহের সামষ্টিক রূপই আল কুরআন। সুতরাং উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আল-কুরআনের ন্যায় হিকমতপূর্ণ একটি কিতাব নাযিল হওয়াটা তাঁর উম্মীত্বের জন্য অতি বড় মু'জিযা নয় কি ? অথচ তিনি যদি লেখাপড়া জানা পণ্ডিত হতেন, তবে এ বিষয়টিকে কেউ মু'জিযা হওয়ার মতো বিষয় বলে কল্পনা করতো কি-না তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এছাড়া 'মহাগ্রন্থ আল কুরআন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র (ﷺ) রচিত নয়; বরং তা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত'—এ সত্যটির অকাট্যতা বজায় রাখার জন্যও আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূলকে উম্মীত্ব দান করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা বহাল রেখেছিলেন।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহেও বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষ আগমনকারী নবী হবেন উম্মী। আর এ বিষয়টিতো ঈমানের অঙ্গই যে, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-ই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আগমন করবেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (عليه السلام)-এর প্রতি যে সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে লেখা রয়েছে: 'আপনার (অর্থাৎ ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর) সন্তানদের মধ্যে বংশের

ক্রমধারা চলতে থাকবে, অবশেষে উম্মী নবী আগমন করবেন। তিনি হবেন সর্বশেষ নবী।' (খাসায়েসুল কুবরা : ১:৯)

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি বণূ মালিকের লোক নিয়ে মিসর ও এস্কেন্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকাসের নিকট গেলেন। সেখানে বাদশাহর সাথে তাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। এরপর তারা জনৈক পাদ্রীর নিকট যান এবং তিনি পাদ্রীকে বললেন, আমাকে বলুন! নবীদের মধ্যে কোন নবীর আগমন এখনো কি অবশিষ্ট রয়েছে? পাদ্রী বললেন, হ্যাঁ অবশিষ্ট রয়েছেন তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর মধ্যবর্তীকালে আর কোন নবী আসবেননা। হযরত ঈসা (আঃ) আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি হবেন 'উম্মী' নবী এবং তিনি হবেন আরবী নবী। তাঁর নাম আহ্‌মাদ। তিনি না দীর্ঘকায়, না বেটে (বরং মধ্যম দেহের অধিকারী)। তাঁর চোখের শুভ্রতার মধ্যে কিছুটা লাল ডোরা থাকবে। (খাসায়েসুল কুবরা : ২:১২)

আল্লাহ্‌ প্রেরীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) যে উম্মী ছিলেন তার আরও একটি বড় প্রমাণ হলো– তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয়, সে সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে পড়তে বললে তিনি বলেছিলেন আমি পড়তে সক্ষম নই। (সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম-এ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে)

পরিশিষ্ট : বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে পড়ালেখা জানাটা একজন ব্যক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তি ও পরিপূর্ণ বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে বিবেচ্য। তাই যে পড়া-লেখার সুযোগ পেয়েছে সে আল্লাহ পাকের এক মহা অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছে। আর যে পড়া-লেখার সুযোগ পায়নি সে আল্লাহ্‌র এক মহা অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। কথা গুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটি তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার পড়ালেখা ব্যতীত জ্ঞানার্জন ও হিকমত লাভের ভিন্ন কোন পন্থা নেই। সুতরাং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে জাগতিক ধ্যান-ধারণার লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জন থেকে মুক্ত ছিলেন সেটি কোন ক্রমেই তাঁর পূর্ণত্বের দিক থেকে বিন্দুসম ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য নয়। কারণ প্রচলিত সংজ্ঞায় 'নিরক্ষর' হওয়ার পরও তিনি যে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী, চিকিৎসক,

বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক ও সমরবিদ তা কে অস্বীকার করতে পারে? আর মানুষ যে জ্ঞানার্জনের দ্বারা পূর্ণত্ব দাবী করে সে জ্ঞান কখনোই একশত ভাগ সত্যের উপর প্রতষ্ঠিত নয়। অথচ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পূর্ণত্ব ঘটেছে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রেরিত ওহীর জ্ঞান দ্বারা যা পুরো একশত ভাগ সত্য।

নবী করীম (ﷺ)-এর 'উম্মী' হওয়ার বাস্তবতা এই যে, বাগ্মিতা, বিচক্ষণতা, তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অবগতি সর্বোপরি শিক্ষাগত ও কার্যগত অসাধারণ প্রতিভা যদি কোন পড়ালেখা জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে তা হয়ে থাকে তার সে পড়ালেখারই ফলশ্রুতি; কিন্তু একান্ত নিরক্ষর একজনের দ্বারা উলিখিত বিষয় সমূহ প্রকাশ পেলে তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা বৈ কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) জাগতিক ধ্যান-ধারণা প্রসূত শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেননি এবং কোন মানুষও তাঁর শিক্ষক ছিলেন না। অথচ আল্লাহ্ পাকের একান্ত ইচ্ছায় ও অশেষ রহমতে উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তিনিই মানব সমাজে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হয়েছেন, সকল শিক্ষকের শিক্ষক হয়েছেন। সুতরাং উম্মীত্ব সাধারণ লোকের জন্য ত্রুটি বা অগৌরবের কারণ হলেও নবী করীম (ﷺ)-এর জন্য তা ছিলো অলংকার স্বরূপ, বিশাল গৌরবের। সারকথা হলো, তাঁর পূর্ণতার জন্য, আল কুরআনের অকাট্যতার জন্য উম্মীত্ব ছিলো আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত, মহা অনুগ্রহ, এক অনন্য মু'জিযা।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শাহী দরবারে আরয, তিনি যেন তাঁর প্রেরিত উম্মী নবী মুহাব্বতের বান্দা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনকে সহীহ্ ও পরিপূর্ণরূপে জানার এবং তাঁর আদর্শকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার তাওফিক দান করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তথ্যসূত্র :

১. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা- শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন, ২. সীরাতে রসূলে-আকরাম (ﷺ) (বাংলা অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)- মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), ৩. খাসায়েসুল কুবরা (বাংলা অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)- আলামা জালালুদ্দীন সিয়ুতী (রহ.) (১ম ও ২য় খণ্ড), ৪. ফাতাওয়ায়ে সিদ্দিকীন (৩য় খণ্ড)- ইশাআ'তে ইসলাম কুতুবখানা, ৫. তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (বাংলায় অনুদিত তাফসীর-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)- মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), ৬. আল কুরআনুল কারীম ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর- ই.ফা. বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি

যুদ্ধের সাফল্যের জন্য সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন একজন সুদক্ষ ও পরিপূর্ণ সমরনীতিবিদের, যার দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশের উপর সবকিছু নির্ভর করবে। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন কোন যুদ্ধনিপূণ সেনাপতির, যার আদেশে সৈন্য বাহিনী পরিচালিত হবে। একজন আদর্শ সেনাপতির মাঝে ঈমানদারী, সততা, সাহস, ধৈর্য্যশীলতা, ত্যাগ, মানবতাবোধ, সহনশীলতা, সকলের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলী অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-ই এক্ষেত্রে একমাত্র উদাহরণ, যিনি উল্লিখিত সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও তিনি একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ সমরনীতিবিদ ছিলেন, অপরদিকে তেমনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তিনি এমনভাবে তাঁর মুজাহিদ বাহিনীকে গড়ে তুলেছিলেন যে, বিশ্বের বুকে এর সমকক্ষ ছিল না, আজও নেই।

রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদসমূহে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ বাহিনী একদিকে যেমন ছিল ক্ষুদ্র, অপরদিকে তাদের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। কোন কোন জিহাদেতো শত্রুপক্ষেও সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্র-সম্ভারের বিপরীতে সেসব দশভাগের একভাগও ছিলনা। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! এসব অসামঞ্জস্যতা তাঁর বিজয়কে কোনভাবেই রোধ করতে পারেনি। তিনি জীবনে কোন যুদ্ধেই পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) ন্যায় সীমিত যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে দুনিয়ার অন্য কোন সেনাপতি এতো বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) জিহাদের মাহাত্ম ও বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর বিজয়ের সাফল্যকে বিচার-বিবেচনা করলেও দুনিয়ার কোন সেনাপতি বা সমর বিশারদকে তাঁর সাথে একই কাতারে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

রাসূলে আকরাম (ﷺ) যেরূপ সামরিক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মুজাহিদদের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেছিলেন; তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, একজন পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক

এবং পূত-পবিত্র নবী ও রাসূল হওয়ার পাশাপাশি নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যে দক্ষতার সাথে রক্ষণ ব্যুহ রচনার মাধ্যমে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তৎকালীন বিশ্ব সে সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখতোনা। আর এ যুগের বিধর্মী সমর-কুশলীরাতো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রদর্শিত রণনৈপুন্য ও কৌশলকে রীতিমত প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। 'লাইফ অব মোহাম্মদ' গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক টম এন্ডারসন পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন–

'একথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করে নেয়া উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মোহাম্মদ (ﷺ) শত্রুপক্ষের মুকাবালায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও অপরিকল্পিত যুদ্ধের মুকাবালায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।'

জেনারেল আকবর খান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হাদীসে দেফা'য় ('ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী কর্তৃক বাংলায় অনুদিত) 'বিশ্ববিজয়ী জেনারেলগণ' শিরোনামের অধ্যায়টিতে কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হওয়া সংক্রান্ত অকাট্য সত্যটিকে খুবই সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তার ভাষায় :

'আলেকজান্ডারকে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' বলা হয় এজন্য যে, তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তাঁকে পরিপূর্ণ জেনারেল বলা যায় না। কেননা, তাঁর নিজের সেনাবাহিনীই কোন এক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যার দরুন শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করে ভারতবর্ষ হতে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যেতে হয়েছিল।'

'নেপোলিয়নের সামরিক ও রণ-প্রতিভা ছিল নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। তিনি সমগ্র ইউরোপকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। ইউরোপবাসীরা তার অসম সাহসিকতা ও প্রতিভার কারণে তাঁকে একাই দশ সহস্র সৈনিকের সমকক্ষ বলে মনে করত। তাঁর উদ্ভাবিত ও অনুসৃত রণনীতি ছিল ত্রুটিহীন ও কার্যকরী। ইউরোপের সামরিক বিদ্যালয়গুলিতে

সেসব পড়ানো হয়। কিন্তু তাঁর মত যশস্বী জেনারেলও শেষ পর্যন্ত পরাজয়বরণ করেন এবং নিতান্ত নিঃসহায় ও মজবুর মানুষের ন্যায় নির্বাসনে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁকেও একজন সফল, সার্থক ও পরিপূর্ণ জেনারেলরূপে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হওয়াটা স্বাভাবিক।'

'লায়ন হার্ট (সিংহহৃদয়) রিচার্ডও বহু যুদ্ধ বিজয়ের শিরোপা লাভে ধন্য হন। অথচ তিনিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মারা যান। হ্যানিবলের পরিণতিও তার মতোই হয়েছিল। গত শতাব্দিতে জার্মান অধিপতি হিটলার সমগ্র পৃথিবীকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলেন এবং অনেক দুর্ধর্ষ শক্তিকেও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সকল লীলা সাঙ্গ করে যেতে হয়েছে। কাজেই সঠিক অর্থে তাকেও পরিপূর্ণ ও সফল সেনাপতি হিসেবে বিবেচনা করা চলে না।'

একজন সেনাপতির ভেতর সহ্যশক্তি তাঁর যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী হয়ে থাকে। পরাজয় ও ব্যর্থতার প্রভাব মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ভীরুতা, স্বল্পবুদ্ধিতা, নিষ্ঠুরতা এবং বিদ্রোহাত্মক আচরণের ন্যায় দূর্বলতা সৃষ্টি করে; কিন্তু নেতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত, দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মবুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং যোগ্যতা তার অধীনস্ত সৈন্য বাহিনী থেকে এসব দূর্বলতাকে দূরে রাখে। এসব দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যতীত দুনিয়ার অপর কোন সেনাপতি দৃষ্টিগোচর হন না যিনি এই মাপকাঠিতে সম্পূর্ণরূপে উৎরে যেতে পারেন। মোটকথা, যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য যুদ্ধের নীতি-নির্ধারণ হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদে যে পরিমাণ বিচক্ষণতা, নিপুণতা, দক্ষতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তা দুনিয়ার কেউ আজ পর্যন্ত পূর্ণরূপে প্রদর্শন করতে সক্ষম হন নি। তবে, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। একমাত্র তিনিই পেরেছেন সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমরবিদ ও সেরা সেনাপতির তাজ একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) মস্তকেই শোভা পায়, অন্য কারও নয়।

জান্নাতের পথে ঝরে পড়া প্রথম তপ্ত রুধির

হারিস, মালিক, ইয়াসির। তিন সহোদর। ইয়ামেনের তেহমা গ্রামের অধিবাসী। হারিয়ে যাওয়া এক ভাইয়ের খোঁজে মক্কায় এসেছে। মরুপথে দীর্ঘদিনের সফরে ক্লান্ত শরীর আর চলতে চায় না। তাই তিন ভাই একে অপরের উদ্দেশ্যে বলছিল, চলো মক্কায় কিছুদিন বিশ্রাম করি। অতঃপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাই যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের শারীরিক ক্লান্তি দূর করে দেন আর সফরের জন্য প্রয়োজনীয় খরচও জুটে যায়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিন ভাই কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলো। দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করলো ; কিন্তু কেউ তাদেরকে কিছুই দিলো না। অবশেষে তারা কুরাইশদের সভাস্থল দারুন নাদওয়ায় গিয়ে তাদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ভোর হতেই সেখানে উপস্থিত হলো হুযাইফা ইবনে মুগীরা মাখ্যুমী। সে ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিকত্রয়কে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। কুরাইশদের ঐতিহাসিক মেহমানদারীর অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন আর সমাদরে খাওয়ালো। থাকার জন্য জায়গা করে দিলো নিজ বাড়ীতে। আবু হুযাইফা মেহমানদের খেদমত আর দেখা শুনার জন্য এক ক্রীতদাসী নিযুক্ত করে দিলো। নাম তার সুমাইয়া বিনতে খাববাত। গাত্র বর্ণ কালো হলেও বসন্তের আগমনে দেহ ভরে উঠেছিল কানায় কানায়। বাসন্তী হাওয়া তার কৃষ্ণকায় মুখমণ্ডলে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে সকাল-সন্ধ্যা মেহমানদের খানা নিয়ে আসতো আর অন্য সময়ে তাদের কাজ কর্ম করে দিতো। এ কিশোরীর তরঙ্গায়িত তরঙ্গিনীর ঢেউ ইয়াসিরের বিশুষ্ক, বিদগ্ধ পৌরুষ সুলভ প্রাণ মল্লিকায় আঘাত হানলো। এ বসন্ত ফুলের সৌরভ তার সফরের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিলো। শেষ পর্যন্ত এ কিশোরী বালিকার স্নিগ্ধ আকর্ষণই যুবক ইয়াসীরকে মক্কায় থেকে যেতে বাধ্য করলো।

সফরের ক্লান্তি দূর হওয়ার পর ইয়াসিরের ভাইয়েরা যখন মাতৃভূমি ইয়ামেনে ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলো তখন তারও ইচ্ছে হয়েছিল বুড়ো পিতা আর বিরহিনী বৃদ্ধা মায়ের সাথে গিয়ে সাক্ষাত করবে, কিন্তু সে তার অন্তরের ওপর জয়ী হতে পারলো না। তাই যুবক ইয়াসির ভাইদের বিদায় দিয়ে নিজে মক্কায় ফিরে এলো। অতঃপর কিছুদিন আবু হুযাইফার

মেহমান হিসাবে কাটানোর পর তার সাহায্যকারী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে মক্কায়ই রয়ে গেলো।

আবু হুযাইফার মেহমান হিসাবে ইয়াসিরের দিন ভালোই কাটছিল। সে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে কথাবার্তা বলতো। দুপুরে বাড়ী এসে খানাপিনার পর কিছুটা সময় বিশ্রামের পর বিকেলে মক্কা নগরীর এখানে সেখানে জীবিকা সংগ্রহের জন্য কাজ-কর্ম করতো।

একাগ্রতা ও সততার জন্য ইয়াসির সবার কাছে বেশ সমাদর পেতো। মাঝে মধ্যে লোকদের কাজ-কর্ম করে বেশ দু'পয়সা রোজগারও হয়েছিল। এবার তাই নিজেই একটা ঘর করে সেখানে বসবাস করার মনস্থ করলো। আবু হুযাইফা তার এ ইচ্ছায় সানন্দে সম্মতি দান করলো।

কিন্তু এরই মধ্যে আবু হুযাইফা ইয়াসিরের ভেতর এক গভীর ভাবান্তর লক্ষ্য করলো। মনে হয় তার চেহারায় যেন কিসের এক আকুলতা। মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। এমতাবস্থায় আবু হুযাইফার দিল মেহমানের জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। সে ইয়াসিরকে বলল, তুমি কি আমার মেহমানদারীতে অসন্তুষ্ট ? দেখ, মেহমান আমার ঘর হতে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলে আমার উপর দেবতাদের অভিশাপ নেমে আসবেই আসবে।

আল্লাহ্র কসম! তোমার মেহমানদারীতে আমারতো কোন কষ্টই হয়নি বরং এমন আয়েশী জীবন অতীতে আমার নসীবে জোটেনি। আসলে কথা হচ্ছে, তোমার ঘরে আমার একটা চির আকাঙ্খিত জিনিস রয়েছে যা না পেলে এ দুনিয়ায় আমার বেঁচে থাকাটা অর্থহীন।

–আমার ঘরে তোমার কাঙ্খিত বস্তু! বলো, এক্ষুনি বলো সেটা কি? আমি যেভাবেই হোক তোমার আকাঙ্খা পুরণ করবো।

–লজ্জায় লাল হওয়া মুখমণ্ডল আড়াল করতে মাথা নত করবো ইয়াসির। মুখ থেকে তার কথা সরছে না। তবু সাহসে ভর করে সকল লজ্জা ঝেড়ে ফেলে কোনমতে জবাব দিল– সে জিনিস হলো তোমার ঐ কৃষ্ণকায় কৃতদাসী সুমাইয়া। খোদার কসম! বিশ্বাস করো, কখন যে কোন দূর্বল মুহূর্তে মনের অজান্তে তার ভালবাসার ঢেউ আমার হৃদয়ে এসে লেগেছে তা আমি নিজেও জানি না।

–ও এই কথা! তাহলে সুমাইয়াকে পেলেই তোমার মনে শান্তি ফিরে আসবে? সে তো আমার একটা ক্রীতদাসী মাত্র! আর খোদার রহমতে

এমন বহু ক্রীতদাসী আমার বাড়ীতে আছে। আচ্ছা, তাহলে এসো, ওকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে তোমার মনবাঞ্ছা পূরণ করছি। এবার তুমি সন্তুষ্ট তো?

–হায় আমার আশ্রয়দাতা কুরাইশ সর্দার! এতে কি আর আমার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে? তুমি কি চাও এক ক্রীতদাসীকে বিয়ে করে আমি কেবল দাসপুত্র আর দাসীকন্যা জন্ম দিতে থাকি? না মান্যবর, এতে কোন কল্যাণ নেই।

–না ইয়াসির, দোস্ত আমার! ভিনদেশী হলেও তুমি আমার আপন হতেও আপন, অতি ঘনিষ্ঠজন। এসো, আজই সুমাইয়ার সাথে তোমার বিয়ে। আর বিয়ের সাথে সাথেই সে আযাদ। কি এবার সন্তুষ্ট হলে তো?

–হ্যাঁ আমি সন্তুষ্ট। আজ আমি বুঝতে পারলাম তুমি যেমন মহৎ, তোমার কীর্তি তার চেয়েও মহৎ; কুরাইশ কুলের গৌবর তুমি।

–না, না, চুপ করো ইয়াসির! এতো প্রশংসা পাবার যোগ্য আমি নই। আজ বিকেলে আমার ঘরে এসো, আজই তোমাদের বিয়ের কাজটা সম্পন্ন করতে চাই। জানতো শুভ কাজ যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। প্রার্থনা করি দেবতাদের সুনজর নেমে আসুক তোমাদের উপর।

অতঃপর বিয়ে হয়ে গেল ইয়াসির আর সুমাইয়ার। এরপর সময় অতিবাহিত হলো তার নিজস্ব নিয়মে। যথাসময়ে তাদের ঘর আলো করে জন্ম নিলো এক পুত্র সন্তান। নাম রাখা হলো আম্মার। আম্মার বিন ইয়াসির। এই সেই বীর, মর্দে মুজাহিদ যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পবিত্র জবান হতে নিজ শাহাদাতের সুসংবাদ শুনেছিলেন।

ইয়াসিরের বয়স ক্রমে বার্ধক্যের কোঠায় উপনীত হয়েছে। শরীরের সাথে ব্যবহারের ভারসাম্যতাও নষ্ট হয়ে গেছে। মেজাজ সবসময় খিটখিটে থাকে। ঘরের সমস্ত লোক এমনকি প্রিয়তমা স্ত্রী সুমাইয়াও তার একটানা চিৎকার আর চেঁচামেচিতে অতিষ্ট, বিরক্ত। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার একটি স্বভাব বাড়ির সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে তা হলো, ভোর হবার বহু পূর্বেই ঘুম থেকে জেগে চিৎকার চেঁচামেচির মাধ্যমে বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে তোলা।

কিন্তু একদিন ইয়াসিরের স্বভাবের বিপরীত দেখা গেল। মক্কার পাহাড়ের চূড়াগুলোয় রোদ ঝলমল করছে অথচ ইয়াসিরের কোন সাড়া-শব্দ নেই। এতে বাড়ির সবাই স্বস্তি পেলেও সুমাইয়া স্বামীর এমন অভ্যাসের

বিপরীত দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সে স্বামীর বিছানার নিকট গিয়ে বললো– কিগো, তোমার শরীর খারাপ নাকি?

–না কোন অসুখ করেনি।

–মুখটা অমন মলিন কেন?

–ও কিছুনা।

–এতো বেলা হয়ে গেলো এখনো উঠছোনা যে?

–এসো সুমাইয়া, আমার বুকে একটু হাত রাখ।

স্বামীর কথায় সুমাইয়া আশ্বস্ত হলো। তার মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ হাসির একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। প্রত্যুত্তরে ইয়াসিরও মুচকি হাসার চেষ্টা করলো কিন্তু ঘুমের মাঝে সেই বিভৎস স্বপ্নের কথা সে ভুলতে পারছে না। ভয়ে তার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সে বললো– সুমাইয়া, আজ আমি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি। উহ্ কি বিভৎস দৃশ্য!

–আচ্ছা, শোনাও তো তোমার সেই স্বপ্নটা, এতে তোমার মনের ভয় কিছুটা হলেও দূর হবে হয়তো।

ইয়াসির ভয়ে কাঁপছিল। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে ধীরে ধীরে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলো। কিন্তু এর সামান্য অংশ শুনেই সুমাইয়া থরথর করে কাঁপতে লাগলো। ইয়াসির বলে চলছে– ...একটা মধ্যম আকারের মাঠ। তার দু'দিকে আকাশ ছোঁয়া দু'টি বিশাল পাহাড়। হঠাৎ এক বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো পাহাড়ে। বিস্ফোরণে পাহাড়ের স্থানে স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়ে কিছু অংশ জমীনে পতিত হলো। পতিত অংশগুলো হতে এক বিশেষ ধরনের আগুন জ্বলে উঠলো। যে আগুন দুনিয়ার কেউ কখনো দেখেনি। মাঠের একদিকে ছিল ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট চারণ ভূমি। আগুন সে চারণ ভূমির নিকটবর্তী স্থানে এসে থেমে গেলো। হে সুমাইয়া! আমি তোমাকে সেই অনিন্দ্য সুন্দর চারণভূমিতে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি। যেখান থেকে তুমি আমাকে হাত ও চোখের ইশারায় ডাকছো। আর আমার পেছন থেকে পুত্র আম্মারও আমাকে ঐ আগুনের ভেতর দিয়ে তোমার দিকে যাওয়ার জন্য উত্তেজিত করে তুলছে। একদিকে তোমার আহ্বান আর অন্যদিকে পুত্রের অনুরোধ, অবশেষে যেই না তোমার দিকে যাওয়ার জন্য সামনের দিকে পা বাড়িয়েছি অমনি সেই ভয়ানক আগুনের উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করে এবং তারপর ঘুম ভেঙ্গে যায়।...

এ পর্যন্ত বলেই ইয়াসির হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। সুমাইয়াও ভয়ে কাঁপছিলো। সে বলতে লাগলো– আয় মাবুদ ! আমার স্বামীকে সমস্ত বিপদ-মুসিবত থেকে মুক্তি দিন। অতঃপর স্বামীর উদ্দেশ্যে বলল– এসো কিছু খেয়ে নাও, তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে বড় কোন দরবেশের নিকট থেকে এর তাবীর (ব্যাখ্যা) জেনে আসতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ইয়াসির কুরাইশদের সবচেয়ে বড় উপাসনালয় বনু মাখযুমের সভায় গিয়ে সালাম দিয়ে বসে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো আজ আর কেউ তার সালামের জবাব দিলো না। এমনকি তার আগমনে বিন্দুমাত্র আগ্রহও প্রকাশ করলো না। মনে হলো তারা যেন তার আগমনে অসন্তুষ্ট। ইয়াসির এতে অপমান বোধ করলো এবং রাগে-ক্ষোভে সে স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলো। এমন সময় আবু জাহেল বলে উঠল– ইয়াসির, বলি ব্যাপারটা কি? আজ এতো বিলম্বের কারণ?

–জ্বী হ্যা, আবুল হাকাম, বিলম্বের কারণতো একটা নিশ্চয়ই আছে!

অতঃপর আবু জাহেলের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উমর ইবনে হিশাম এগিয়ে এসে বললো– ধোঁকাবাজীর স্থান এটা নয়। তোমার কি জানা নেই, তোমার ছেলে আম্মার গতকাল থেকে বেদ্বীন হয়ে গেছে। মানে পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ আর তাঁর অনুসারীদের অনুসরণ আরম্ভ করে দিয়েছে।

একথা শুনা মাত্রই ইয়াসির সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে সে বলল– বড় লজ্জার ব্যাপার উমর! বড় লজ্জার কথা আবু জাহেল! তোমরা আমার ছেলের কারণে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলে অথচ খোদার কসম! দু'দিন যাবত তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। তাছাড়া তোমাদের এসব লাগামহীন উক্তি কেন সব স্থানেই ব্যবহার করছো না? তোমাদেরই মত আরেক নেতা আরকাম ইবনে আবু আরকামতো তার নিজের ঘর মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে আর সেখান থেকেই তো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাদের নতুন মতবাদ প্রচার করছে আর তোমাদের মা'বুদদেরকেও গালি দিচ্ছে। তাকে কেন পাকড়াও করছো না? কারণ তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি বললে তার আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে যে তোমাদের ও তোমাদের হোবল ঠাকুরের পিণ্ডি দেখিয়ে ছাড়বে।

এ পর্যন্ত বলেই ইয়াসির আর দাঁড়ালো না, নিজ ঘরের দিকে রওনা হলো। ঘরে সে ফিরে এলো ঠিকই কিন্তু ঘরে ফিরে তার মনে হলো– ঘরের সব কিছুই যেন কেমন বদলে গেছে। ঘরের লোকদের চলাফেরা, উঠাবসা, সব সবকিছু। স্ত্রী সুমাইয়া ঘরের ভেতর আসতেছিল। তাকে দেখে তার মনে হলো, এ যেন তার স্ত্রী সুমাইয়া নয়, সাক্ষাত রূপকথার কোন পরী তার ঘরে নেমে এসেছে। সুমাইয়ার এমন মনভুলানো স্নিগ্ধ রূপলাবণ্য ইয়াসির তার জীবনের ভরা বসন্তেও দেখেনি। সে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলো একি সত্যিই তার স্ত্রী সুমাইয়া না তার রূপ ধারণ করা কোন জীন-পরী কিংবা জান্নাতী হুর?

স্বামীকে ওভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসতে হাসতে সুমাইয়া তার অতি নিকটে চলে এলো, বলল– কিগো অমন তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে? বলো– আলহামদুলিল্লাহ! আজ আমাদের প্রিয় আম্মার আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের শান্তি নিয়ে এসেছে।

–পরকাল? কিসের পরকাল? রাত হলে বিভৎস স্বপ্ন আর দিনে মানুষের রুক্ষ আচরণে আমি সত্যিই দিশেহারা। তার উপর আবার এসব কি বলছো? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু খোলাসা করে বলো।

–শুকরিয়া আদায় করুন আব্বাজান। আমি আপনার জন্য এমন এক সৌভাগ্যের পরশমণি নিয়ে এসেছি যার ছোঁয়ায় লোহাও সোনায় পরিণত হয়ে যায়।

–তুই আবার কী বলতে চাস? বলি তোর মতলবখানা কী? তুই নাকি পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গেছিস? আরে কমবখ্‌ত! তোর কারণে তোর পিতার উপর যে আজ মুসিবত নেমে এসেছিলো তার খোঁজ কি রাখিস?

–মুচকি হেসে আম্মার বলল, বেদ্বীন কি বলছেন আব্বা; বলুন দ্বীনদার হয়েছি। আমরা অসীম নে'য়ামত লাভ করেছি। আমি আজ অধর্ম হতে ধর্মে ফিরে এসেছি। আমি তো সেই ইলাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি, যিনি আসমান, জমিন ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃজন করেছেন আর মুহাম্মদ (ﷺ)কে আমাদের জন্য নবী এবং পথ প্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন। যিনি আমাদের সরল-সহজ পথ, মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল বক্তব্য হলো : আল্লাহ্‌ই একমাত্র মা'বুদ। মানুষের হাতে গড়া দেব-দেবী মিথ্যা, মাটি-পাথরের নিশ্চল পুতুল মাত্র। সৎকর্মশীলরা মৃত্যুর

পর অপরূপ কানন আর ঝর্ণাধারা বেষ্ঠিত সুরম্য বালাখানা লাভ করবে আর স্রষ্টার আদেশ অমান্যকারীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে অনন্তকাল জ্বলতে থাকবে।

বৃদ্ধ ইয়াসিরের মুখমণ্ডল পুত্রের এসব কথা শ্রবণমাত্র আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে প্রায় বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। স্ত্রী-পুত্র তাকে উঠিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। ইয়াসিরের চোঁখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে। সে বলতে লাগলো হ্যাঁ, এতো সেই মা'বুদ যার কথা আমি বিশ বছর বয়সে যখন মক্কায় আসি তখন আবু হুযাইফাকে বলেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম আমার মা'বুদ হবে অসীম ক্ষমতার অধীকারী, এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সাহায্যকারী বা অংশীদার থাকবে না। সে তোমাদের নিশ্চল-নিশ্চুপ হাতে গড়া পুতুল দেবতার মতো নয়। বেটা আমার! তুমি মুহাম্মদের (ﷺ) নিকট যে মা'বুদের কথা শুনেছ নিঃসন্দেহে সেটাই আমার হারানো মানিক, চির আকাঙ্খিত পরশমণি। ওগো সুমাইয়া এসো, এসো সেই মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। আম্মার, বাপ আমার! আমাকে কখন নিয়ে যাবে নবীয়ে আরাবী মুহাম্মদের (ﷺ) নিকট? আমি তাঁর মুক্তির বাণী গ্রহণ করতে যাবো।

–নিশ্চয়ই যাবেন আব্বাজান! চলুন, এক্ষুণি চলুন।

ইয়াসির স্ত্রী সুমাইয়া, পুত্র আম্মারের সাথে আজ স্বপরিবারে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ইয়াসির পরিবারের ঈমান আনার কথা শুনে সেদিনই বিকেল বেলা আবু জাহেল বনু মাখযুম গোত্রের কতিপয় লোক নিয়ে ইয়াসিরের বাড়িতে উপস্থিত হলো। সে কোন প্রকার বাক্য ব্যয় না করে বৃদ্ধ ইয়াসির ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে আটকে রাখলো আর তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলো। এসব ঘটনায় ইয়াসির আজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। সে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী সুমাইয়াকে বললো– দ্যাখো, আমার সেই স্বপ্ন আজ আমার সম্মুখেই বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

–ওসব কিছুই নয় আব্বা, ধৈর্য ধরুন, এর পরেইতো আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের নির্মল ঝর্ণধারা ও সুশোভিত কানন পরিবেষ্ঠিত বালাখানা আর আরশে আজিমের দুর্লভ সান্নিধ্য।

পরদিন কুরাইশদের এক সভা অনুষ্ঠানের পর আবু জাহেলের নেতৃত্বে একদল লোক সেই প্রকোষ্ঠের নিকট এসে দাঁড়ালো যেখানে

ইয়াসির, সুমাইয়া আর তাদের পুত্র আম্মারকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রকোষ্ঠ থেকে বন্দিদেরকে শিকলবাঁধা অবস্থায় বের করে আনা হলো। আবু জাহেল পিছন থেকে ধাক্কা মেরে বন্দিত্রয়কে সামনের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। শিকল বাঁধা অবস্থায় হাঁটতে গিয়ে তাঁরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আর পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহেলের লোকজন তাদের বুকে-পিঠে বর্শা, তীর, তলোয়ার প্রভৃতি ধারালো অস্ত্রের খোঁচা মেরে মেরে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দিচ্ছিল। এসবের সঙ্গে আবার কোড়া মারাও হচ্ছিল। দ্বীনের মুজাহিদত্রয়ের উপর এমন নির্মম আচরণে আকাশ-বাতাস শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠলেও পাষণ্ডদের আচরণে একটুও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না বরং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে তিন মজলুমের চুল-দাড়ি ধরে টেনে বাঁশি বাজিয়ে চিৎকার দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথের পাশের জনতা লক্ষ্য করলো এতো নির্মম অত্যাচারের পরও বন্দিদের মুখে উহ শব্দটি পর্যন্ত নেই। উপরন্তু তিনজনের মুখেই মুচকি হাসি জান্নাতী দীপ্তির ন্যায় চমক দিচ্ছে।

মজলুম অত্যাচারিতের কাফেলা ধীরে ধীরে যালিমদের সাথে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো। মক্কার বাইরে এক বালুকাময় ময়দানে এসে সকলেই থেমে গেল। আবু জাহেল ইয়াসিরের সঙ্গে বিভিন্ন বিদ্রুপাত্মক শব্দে তর্ক জুড়ে দিলো। তর্কের এক পর্যায়ে আবু জাহেল লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ইয়াসিরের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলো। মর্দে মুজাহিদের খুনে লাল হয়ে উঠলো মরুর বালুকনা। ওদিকে আবু জাহেলের লোকজনও তার অনুসরণে সুমাইয়া এবং আম্মারের মুখে আঘাতের পর আঘাত হেনে রক্তে রঞ্জিত করে দিলো তাদের পবিত্র দেহ। ইয়াসির পরিবারের মুজাহিদত্রয়ের রক্তে আরব মরু সর্বপ্রথম রঞ্জিত হলো।

আবু জাহেল এবার বন্দিদের চিৎ করে শোয়ালো। এ সময় তার সঙ্গীরা এসে বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি আগুনে পুড়িয়ে টকটকে লালবর্ণ করে তাঁদের বুকে, পিঠে, মুখে দাগ দেয়া শুরু করলো। ভারি ভারি পাথর এনে তাদের বুকের উপর চাপিয়ে দিলো, মুখের উপর রাখলো পানি ভরা বড় বড় চামড়ার মশক।

বন্দিদের শরীর থেকে ঝরা রক্তে বালুকাময় মরু সিক্ত হয়ে উঠলো। এই কঠোর পৈশাচিক নির্যাতনের পর আবু জাহেল অপেক্ষা করছিল বন্দিদের বুকফাটা কান্না, চিৎকার কিংবা ক্ষমাভিক্ষার আবেদন-

নিবেদন শোনার। কিন্তু মর্দে মু'মিনদের মুখ থেকে যখন পবিত্র কালেমা শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শোনা গেলনা তখন প্রচণ্ড ক্ষোভে বন্দিত্রয়কে নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিয়ে ক্লান্ত আবু জাহেল বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

এভাবে প্রায় প্রতিদিন ইয়াসির পরিবারের উপর চলছিল নির্মম, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক অত্যাচার। তবে সুমাইয়ার উপর অত্যাচারের মাত্রাটা ছিলো যেন অন্য দু'জনের চেয়ে একটু বেশী। যেমন একদিন হারিস ইবনে হিশাম তার বন্ধু ইকরাম ইবনে আবু জাহেলকে বলছিল– তোমরাতো ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার অবস্থা দেখনি। সে এক যেমন মজার (?) তেমন লোমহর্ষক ব্যাপার। তার উপর যখন শপাং শপাং বেত্রাঘাত আর শপাশপ কোড়ার আঘাত পড়ছিলো তখন সে কেঁচোর মতো গড়াগড়ি দিচ্ছিল। কিন্তু তার মুখ হতে টু শব্দটি পর্যন্ত বেরুলো না আর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো না! তোমরা যদি দেখতে কি নির্মম অত্যাচারইনা তাকে আমরা করেছি। তাকে আমরা যখন ডানদিক থেকে লাথি মারতাম তখন সে ধড়াস করে বামদিকে পড়ে যেত। ঠিক তখনই মুহূর্তের মধ্যে আবার দাঁড়ানোর জন্য আঙ্গুল দিয়ে একটু মাত্র ইশারা করলেই কোথা থেকে যেন শক্তি সঞ্চয় করে কলের পুতুলের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতো। তারপর আবার চলতো লাথির উপর লাথি। শপাং শপাং বেত্রাঘাত। এভাবে সারাটা দিন চেষ্টা করেও তার মুখ দিয়ে দেব-দেবীর একটা নাম দূরে থাক টু শব্দটি পর্যন্ত বের করতে পারি নি। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড মার আর বেত্রাঘাতের চোটে ওর দেহের সমস্ত রক্তই যেন বের হয়ে গেছে।

এসব শুনে ইকরাম বলল, আরে আমার কাছে তো সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয়েছে ওর বুড়ো স্বামী ইয়াসিরের ব্যাপারটা। পিতৃদেবের নির্মম কোড়ার আঘাতে তার শরীর হতে যেন রক্ত-মাংস ছিড়ে বের হয়ে আসছিল। জ্বলন্ত আগুনে ফেলা হলো, পানিতে চুবানো হলো তবুও বুড়ো দেব-দেবীর প্রশংসায় একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না, উপরন্তু দেবতা লাত, ওজ্জা, মানাত, হোবলদেরকে যাচ্ছেতাই বলে গালাগালি করলো!

মাঝে মাঝে অত্যাচারের নিত্য নতুন কৌশল তাদের উপর প্রয়োগ করা হতো। যেমন দেব-দেবীর প্রশংসাবাণী উচ্চারণের স্থলে আপন স্রষ্টার প্রশংসায় অটল-অবিচল সুমাইয়াকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে লৌহ নির্মিত পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

কিন্তু সুমাইয়ার প্রগাঢ় ঈমান আর সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সামনে আগুনের বেষ্ঠনী হয়ে উঠা লৌহার পোশাক বরফ শীতল হয়ে যেত।

এক দুপুরে কুরাইশদের সভা বসেছে। অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আবু জাহেল আজকের এ মজলিসের আয়োজন করেছে। সে স্বগর্বে সভাস্থলে ঘোষণা করলো– আবু জাহেলের জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। নিজেকে আজ সে সার্থকরূপে দরবারে দাঁড় করাতে পেরেছে। আজ সে ইয়াসির পরিবারের লোকদের মুখ দিয়ে দেব-দেবীর প্রশংসাসূচক কথা বের করতে এবং মুহাম্মদকে গালি দেয়াতে সক্ষম হবে।

শ্লোগান উঠলো– জয়... লাত-ওজ্জার জয়। জয়... হোবল ঠাকুরের জয়। শ্লোগানের মাঝেই উতবা ইবনে রবিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না আবুল হাকাম, না। তোমার এ কথা ভিত্তিহীন। ইয়াসির বড় সাংঘাতিক লোক। তোমার জোর-জবরদস্তিতে বুড়োটার হয়তো প্রাণই বেরিয়ে যাবে কিন্তু তোমার কথামতো দেব-দেবীর প্রশংসা তার মুখ দিয়ে বেরুবে না।

–যদি বের হয় তবে?

–তবে আমার পক্ষ থেকে বিশটি উট পুরস্কার।

শাইবা ইবনে রবিয়া বললো, আমার পক্ষ হতেও বিশটি উট পাবে। অতঃপর উতবা ও শাইবা বললো যদি না পারো, তবে?

আবু জাহেল রাগত স্বরে বললো, না পারলে তোমারা আমার জন্য যে সিদ্ধান্ত দিবে তাই হবে।

তিন পাষণ্ড নরপিশাচ এরপর বাজি জেতার জন্য ইয়াসিরের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। অতঃপর এমন নির্মম পৈশাচিক অত্যাচার শুরু হলো যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি। সে কাহিনী লিখতে কলম কেঁপে উঠে। শরীরের লোমকূপে শিহরণ জাগে। কোন পশুর উপরও যদি এমন অত্যাচার হতো তবে কেউ কোনদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারতো না, পারা সম্ভব নয়।

আবু জাহেল এবং তার সাথীদ্বয় সেই পঙ্কিল বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়ালো। যেখানে এক স্থানে গভীর গর্ত খুড়ে তা পানি দ্বারা ভরে রাখা হয়েছে। এক পাশে সাক্ষাত জাহান্নামের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে আর তাতে লৌহার হাতিয়ার পুড়িয়ে লাল করা হচ্ছে। আর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বন্দি তিন মর্দে মু'মিন বেওয়ারিস সম্পদের ন্যায় পথের পাশে পড়ে রয়েছে।

ময়দানে উপস্থিত হয়েই আবু জাহেল বন্দীদেরকে তার সামনে আনার হুকুম করলো। তার খেদমতগারের দল ইয়াসির, স্ত্রী সুমাইয়া আর তাদের পুত্র আম্মারকে এনে বেশ দূর হতেই আবু জাহেলের সম্মুখে ছুঁড়ে ফেললো। মজলুম বন্দিদের মুখে একটানা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হচ্ছিল। ক্রোধে আবু জাহেল হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে তাদের শরীরে এলোপাথাড়ি কোড়া মারতে লাগলো। উত্তপ্ত লৌহাস্ত্র দিয়ে সর্বাঙ্গে দাগ দিয়ে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আবার আগুন হতে উঠিয়ে পানিতে ডুবিয়ে ধরলো। এতে তিন জনেরই শ্বাস বন্ধ হয়ে রক্তবমি শুরু হলো। তারপর পানি থেকে উঠিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ রাখা হলো। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলেই তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসলো ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!

আবু জাহেল এতে যেন উন্মাদ হয়ে গেলো। সকল প্রচেষ্টা বৃথা যেতে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সুমাইয়াকে লক্ষ্য করে বললো– এভাবেই তোকে মরতে হবে, যে পর্যন্ত না আমাদের দেবতাদের প্রশংসা আর মুহাম্মাদের কুৎসা মুখ দিয়ে বের হবে। মনে রাখিস, মুহাম্মদ আর তার আল্লাহকে না ছাড়লে আজ বিকেল দেখাও তোর নসীবে জুটবে না। সুমাইয়া দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে জবাব দিলো, তোর ভণ্ড মা'বুদ জাহান্নামে যাক। মৃত্যুইতো আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর আমি মরে গেলে তো কমপক্ষে তোর এ কুৎসিত বদবখ্‌ত চেহারাটা দেখা হতে নিস্কৃতি পাবো।

সুমাইয়ার এ কথায় উতবা এবং শাইবা হো হো করে হেসে উঠলো। আর এতে অপমানিত আবু জাহেল আরো উন্মত্ত হয়ে সুমাইয়ার পেটে সজোরে লাথি মারলো। সুমাইয়া দূরে ছিটকে পড়লো। সুমাইয়াকে উঠিয়ে এনে আবার তার পায়ের কাছে রাখতেই সে ফুটবলের ন্যায় সজোরে লাথি হাকালো। এভাবে একবার সুমাইয়াকে তুলে আনা হচ্ছে আর আবু জাহেল তাকে লাথি মারছে। আল্লাহ্ ও তাঁর নবী মুহাম্মদের (ﷺ) মহব্বতে সুমাইয়া ধৈর্য্যের পাহাড় হয়ে সকল অত্যাচার সহ্য করতে লাগলো আর মুখে বললো, তোর মা'বুদ জাহান্নামে যাক আল্লাহ্‌র দুশমন!

এবার আবু জাহেল যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে উঠলো। সে সুমাইয়ার তলপেটে সজোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করলো। বর্শা তার লজ্জাস্থানে বিদ্ধ হলো। একটা করুণ আর্তনাদ দুনিয়ার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হলো– আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থেকো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...। সুমাইয়ার দেহ থেকে

জান্নাতের পথে ঝরে পড়লো প্রথম তপ্ত রুধির। চলে গেলেন সুমাইয়া তাঁর মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে চিরদিনের তরে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইসলামের ইতিহাসে শুহাদাদের সোনালী কাহিনী লেখার সূচনা হলো বীরাঙ্গনা সুমাইয়ার তপ্ত রুধিরে।

চিৎকার দিয়ে উঠলো আম্মার। বলল, পাষণ্ড! তুই আমার মাকে জানে মেরে ফেললি? তোর উপর আল্লাহ্‌র গযব! তোর মা'বুদ জাহান্নামে যাক। আমার রাসূল (ﷺ) তোর জন্য জাহান্নাম আর আমার শহীদ মায়ের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

এ দৃশ্য দেখে ইয়াসির বললো, রে আবুল হাকাম! তুই জাহান্নামের ইন্ধন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য।

পাগলা সারমেয়তে রূপান্তরিত হওয়া আবু জাহেল তাকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিলো না। সে তার পেটের উপর সজোরে লাথি মারলো। পূর্বের অত্যাচারে এমনিতেই বৃদ্ধ ইয়াসিরের অবস্থা শোচনীয় ছিল, তাই এ আঘাত তার সইলো না। তার মুখ দিয়েও বের হলো একটা করুন চিৎকার– আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল...। তারপর সব শেষ। ইয়াসিরও তার পরম প্রভুর সান্নিধ্যে যাত্রা করলো।

ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লোহিত বসন পরিয়ে শহীদী খুনে রঞ্জিত করে বিদায় নিলো আল্লাহ্ পাকের ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক মজলুম দম্পতি।

(হযরত ইয়াসির (রা.), হযরত সুমাইয়া (রা.), হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) তিনজনই ইসলামের জন্য জীবনদানকারী মর্যাদাশীল সাহাবা। তাঁদের নামের পাশে রাজিআল্লাহু আনহু/রাজিআল্লাহু আনহুমা ব্যবহৃত হবে)

তাওহীদি শক্তির এক অনন্য বিজয়গাঁথা

৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা মাস। জিহাদী কাফেলা ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে। গন্তব্য মূ'তার প্রান্তর। উদ্দেশ্য রাসূলে আরাবী (ﷺ) কর্তৃক প্রেরিত দূত হারিস উমায়ের (رضي الله عنه)কে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তীর্থ করার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছেন। এ সংবাদ কানে আসার পর রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ্ পাকের মনোনীত একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলামে দাখিল হওয়ার আহ্বান লিপিসহ সাহাবী দিহয়িয়া কলবী (رضي الله عنه)কে তার নিকট প্রেরণ করলেন। খৃস্টান পুরোহিতরা রাসূলে আরাবীর এ পদক্ষেপকে অতি বড় ধৃষ্টতা হিসেবে বিবেচনা করলো। তাদের এই ভেবে গাত্রদাহ শুরু হলো যে, পৌত্তলিক আরবের এক নিরক্ষর লোক কিনা রোম সম্রাটকে ধর্মান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে, যে কিনা আবার আল্লাহ্‌র পুত্র (?) যীশুকে মানব সন্তান বলে প্রচার করছে। অতএব তারা সুযোগের অপেক্ষায় রইলো কখন, কিভাবে মুসলমানদেরকে নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করা যায়।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলামের সত্যতা এবং সাম্য-সুন্দর রূপটি উপলব্ধি করতে পারলেন ঠিকই; কিন্তু রাজ সিংহাসনের লোভ তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখলো। উপরন্তু তিনি যখন দেখলেন ইসলামী শিক্ষার ফলে তার অধীনস্ত ছোট ছোট অনেক রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সাহসী হয়ে উঠছে তখন ইসলামের প্রতি সকল দূর্বলতাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ইসলাম নামক বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করার সংকল্প করে বসলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্রসহ সাহাবী হারিস বিন উমায়ের আল-ইয্‌দী (رضي الله عنه)কে দূত হিসেবে বসরার শাসন কর্তার নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মূ'তা নামক স্থানে রোম সম্রাটের অধীনস্ত বসরার গভর্ণর শুরাহবিল ইবনে আমর তাঁকে বন্দি করে আটকে রাখলো। এমনিতেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশ ছিলো

বর্ণনাতীত। সুতরাং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এ সুবর্ণ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইলো না। এ বর্বর পাষণ্ড শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে নির্মম নৃশংসভাবে রাসূলের দূত হারিস বিন উমায়েরকে হত্যা করলো।

ইতোপূর্বে নবীজী (ﷺ)-এর কোন দূতকে হত্যা করা হয় নি। এছাড়া দূতকে হত্যা করা তদানীন্তন জগতের সকল দেশের আন্তর্জাতিক নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং এধরনের দাম্ভিক আচরণ ও আন্তর্জাতিক বিধান লঙ্ঘনে দয়ার নবীজী (ﷺ) যারপরনাই মনোক্ষুণ্ন হলেন এবং স্বীয় সাহাবার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে প্রচণ্ড মর্মাহত হলেন।

মুহাম্মদ (ﷺ) জিহাদের নবী। তাই কাফিরের হাতে একজন মুসলমানের খুন ঝরাকে তিনি বরদাশ্ত করলেন না। এ খুনের বদলা নিতে তিনি যায়েদ বিন হারেসার (رضي الله عنه) নেতৃত্বে তিন হাজার মর্দে মুজাহিদ সাহাবার এক জিহাদী কাফেলা প্রেরণ করলেন।

এই যায়েদ সেই ক্রীতদাস যাকে নবীজী (ﷺ) পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী ও উদারতার এ এক অনন্য উদাহরণ। তিন হাজার সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুহাজির ও আনসারের নেতা নিযুক্ত হলেন একজন ক্রীতদাস!

প্রতিপক্ষ শুরাহ্‌বিল ছিল খৃস্টধর্মের অনুসারী। তাই লড়াইটা মূলত তার একার বিরুদ্ধে শুরু হলেও সমগ্র খৃস্টজগত যে তাকে মদদ করতে উঠে পড়ে লেগে যাবে তা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরকুশলী রাসূলে আরাবীর (ﷺ) অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। সুতরাং জিহাদী কাফেলা রওয়ানা করে দেয়ার পূর্বে মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপদেশ, আদেশ নির্দেশসূচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন–

‘ওহে দ্বীনের মুজাহিদগণ! তোমরা সেনাপতি যায়েদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাণপণ লড়বে। যদি যায়েদ শাহদাত রবণ করে তবে জাফর ইবনে আবু তালেব হবে পরবর্তী সেনাপতি। যদি জাফরও শহীদ হয়ে যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। আর যদি সেও শহীদ হয়ে যায় তবে তোমরা যাকে খুশী নেতা নিযুক্ত করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।’ তিনি আরো নির্দেশ দিলেন– ‘তোমরা সরাসরি ঐ স্থানে গিয়ে উঠবে, যেখানে তোমাদের ভাইকে হত্যা করা হয়েছে।’

নবীজী (ﷺ) এ সমস্ত নির্দেশ-উপদেশ দিতে দিতে জাবালে সালাঅ' (সানিয়াতুল বিদা') পর্যন্ত কাফেলার অনুগমন করলেন। অতঃপর মুজাহিদগণের সুস্থ্য দেহে বিজয়ীবেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আল্লাহ্ পাকের শাহী দরবারে দু'আ করে কাফেলার উদ্দেশ্যে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে আসলেন।

রাসূলে আরাবীর (ﷺ) নির্দেশ মত তিন সহস্র মর্দে মুজাহিদের জিহাদী কাফেলা চলছে মূ'তা অভিমুখে। মূ'তা সিরিয়ার এক ক্ষুদ্র জনপদ। মদীনা থেকে ১১০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম। কাফেলা মা'আন নামক স্থানে পৌঁছল। পৌঁছে গোয়েন্দা মারফত জানতে পারলো রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস 'মাআব' শহরে এক লক্ষ সৈন্য সমেত অবস্থান করছে। এছাড়াও বনু লাখম, বনু জুযাম ও বহরা হতে সম্মিলিতভাবে আরও এক লক্ষ ফৌজ তাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হয়েছে। অর্থাৎ দু'লক্ষ সৈন্য শুরাহবিলের সাহায্যে ময়দানে আসছে।

মুসলিম সৈন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) পক্ষান্তরে শক্র সৈন্য ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) অর্থাৎ মুসলমানদের তুলনায় দুশমন সংখ্যায় প্রায় ৭০ (সত্তর) গুন। তো দু'দলের সৈন্য সংখ্যার এই যখন পার্থক্য তখন মুজাহিদগণ মা'আনে দু'দিন অবস্থান করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। এমতাবস্থায় মুজাহিদদের অনেকেই মত প্রকাশ করলেন যে, শুধু শুধু এই অসম যুদ্ধে প্রাণ না হারিয়ে মদীনায় ফিরে যাওয়া যাক। আবার কেউ কেউ বললেন, আরো সৈন্য সাহায্য চেয়ে নবীজীর (ﷺ) খেদমতে সংবাদ প্রেরণ করে তাঁর নির্দেশের প্রতীক্ষা করাই সমীচীন।

মুজাহিদগণের এমন পলায়নপর এবং কাপুরোষিত মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (رضي الله عنه) তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'হে মুসলিম বীরগণ! শুধু জয়লাভইতো তোমাদের কাম্য নয়, তোমরাতো শাহাদাতের সন্ধানেও বের হয়েছো অথচ আজ তাকে অপছন্দ করছ। তোমরা কি ভুলে গেছ, আমরা কখনো দৈহিক শক্তি, অস্ত্রবল আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক বিবেচনা করে যুদ্ধ করি না। দ্বীন রক্ষা এবং কালেমার ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্কে রাজী-খুশী রাখতেই আমরা কেবল যুদ্ধ করে থাকি। এতে দু'টি সওয়াবের অন্ততঃ একটি অবশ্যই আমাদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে। প্রথমত যদি আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় অপার করুণায় আমাদেরকে বিজয় দান করেন তবে আমরা কৃতকার্য দ্বিতীয়ত

আমরা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র মনোনীত সত্য দ্বীনের জন্য শহীদ হয়ে অমরত্ব লাভ করবো।'

'ওহে জানবাজ সাথীরা! আমরাতো মুসলমান। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলইতো আমাদের পাথেয়। আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করলে তাঁর নুসরত আসবেই আসবে। সুতরাং শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে ভীত হওয়া আমাদের মানায় না।'

'ওহে শাহাদাত পিয়াসী বীরেরা! তোমাদের কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ কী? আল্লাহ্‌ চাহে তো তিন হাজার সৈন্য নিয়েই আমরা দুই লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং বিজয়ী হবো।'

হযরত ইবনে রাওয়াহার উদ্দীপনাপূর্ণ তেজস্বী ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে মুজাহিদদের অন্তরের ঘুমন্ত সিংহকে ঘা মেরে জাগিয়ে তুলল। শাহাদাতের তামান্নায় মুজাহিদ বাহিনী আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে শ্লোগান তুললো–

নারায়ে তাকবীর... আল্লাহু আকবার!
সাবিলুনা সাবিলুনা... আল জিহাদ! আল জিহাদ!
সাবিলুনা সাবিলুনা... আল জিহাদ! আল জিহাদ!

জিহাদের কাফেলা পুনঃ অগ্রসর হয়ে তাখূম পৌঁছল। সংবাদ পেয়ে রোমীয় সৈন্যরাও মুকাবালার জন্য অগ্রসর হলো। মুসলিম বাহিনী মূ'তা পৌঁছে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিলো। ইত্যবসরে শত্রুফৌজও ময়দানে এসে উপস্থিত হলো। দুশমন সেনাপতি শুরাহ্‌বিলের ওষ্ঠাধরে মুজাহিদদের সংখ্যা দেখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। তাচ্ছিল্যের হাসি। বিজয়ের হাসি। মরুর মেষরা বুঝবে এবার যুদ্ধ কাকে বলে! দু' লক্ষের বিপরীতে মাত্র তিন হাজার। ছেষট্টিজনের ভাগে মাত্র একজন! ভীষণ গর্ব তার চলাফেরা আর চাহনিতে। বিজয় আজকে ঠেকায় কে?

সেনাপতি হযরত যায়েদ (রাঃ) ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে বীরের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। সে এক প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ। মরণ-পণ যুদ্ধ। প্রায় ৭০ গুণ কাফিরের মুকাবালায় মুষ্টিমেয় জানবাজ মুজাহিদের পেরে উঠাটা স্বাভাবিক ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র মদদ আর শাহাদাতের তামান্না যাদের পাথেয় তাঁরা কখনো শত্রুর সংখ্যাধিক্যের পরোয়া করে না। শুরাহ্‌বিল ভেবেছিল আক্রমণের সূচনাতেই খড়-কুটার ন্যায় ভেসে যাবে মুজাহিদ বাহিনী। রক্তের স্রোত বয়ে যাবে মূ'তার প্রান্ত

রে। কিন্তু তার সে আশার গুড়ে বালি দিয়ে প্রতিটি মুসলিম সৈন্যই জীবনবাজী রেখে সিংহের ন্যায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। ইসলামের ঝাণ্ডাধারী সেনাপতি যায়েদ (ﷺ) বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শত্রুদের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন।

অতঃপর যায়েদের (ﷺ) স্থলে নবীজীর (ﷺ) নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে নিলেন হযরত জাফর (ﷺ)।

হযরত জাফরের (ﷺ) হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা আসা মাত্রই তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। এরপর সর্বপ্রথম তরবারির আঘাতে নিজের ঘোড়ার পাগুলো নিজেই কেটে ফেললেন। তা এজন্য যে, মনে যেন কখনো পালাবার সংকল্প উদয় হলেও সুযোগ না থাকে। অতঃপর আবৃতি করতে লাগলেন–

'হে লোক সকল! জান্নাত কতই না সুন্দর!
জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া কতই না উত্তম!
জান্নাতের পানি কতই না শীতল!'
'রোমবাসীদের শাস্তি ভোগ করার সময় এসেছে,
আর তা প্রদানের দায়িত্ব পরেছে আমারই উপর।'

কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে করতে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অগনিত কাফির সেনার উপর। সেনাপতি হিসেবে জিহাদের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে থাকায় কাফিররা তাঁর ডান হাত কেটে দিল। কর্তিত হাত থেকে ঝাণ্ডা মাটিতে পরার পূর্বেই তা বাম হাতে তুলে নিলেন। দুশমনরা তার বাম হাতও কেটে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উভয় কর্তিত বাহুমূল ও কাঁধের ফাঁক দ্বারা ঝাণ্ডা বুকে চেপে ধরলেন এবং ঝাণ্ডার গোড়া দু'পায়ের মাঝে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় কাফিররা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাঁর দু'পা কেটে ফেললে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন; কিন্তু ইসলামের ঝাণ্ডাকে মাটিতে পড়তে দিলেন না। এবার তিনি দাঁতের সাহায্যে কামড়ে ধরে ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখার প্রচেষ্টা চালালেন। দুশমনের শত আঘাতের মাঝেও ইসলামের ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বমুখে তুলে ধরতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অচিন্তনীয়। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ প্রয়াসও বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ পশ্চাৎদিক হতে এক দুশমনের প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে তাঁর দেহ

দ্বিখণ্ডিত হয়ে জমীনে লুটিয়ে পড়লো। তিনি চিরকাঙ্খিত শাহাদাতের অমিয় সূরা পান করে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত জাফরের (رضي الله عنه) শরীরের সম্মুখ ভাগে নব্বইটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁর পিঠের উপর একটিও আঘাতের চিহ্ন ছিলোনা। অর্থাৎ ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখার লড়াইয়ে সব আঘাত তিনি বুক পেতে নিয়েছিলেন।

রাসূলে আরাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নির্দেশ মত এবার হযরত আবদুল্লাহ্‌র পালা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (رضي الله عنه) ছুটে এসে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন কিন্তু তিনিও বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। অচিরেই দুশমনের মুহুর্মুহু আঘাতে শহীদ হয়ে অমর জীবন লাভ করলেন।

নবীজী (ﷺ) নির্দেশিত তিন সেনাপতির শাহাদাতের পর মুজাহিদগণ মহাসংকটে পড়লেন। কাকে তাঁরা আমির নিযুক্ত করবেন? কে তুলে ধরবে ইসলামের ঝাণ্ডা? তাঁরা কোন কিছুই স্থির করে উঠতে পারলো না। হঠাৎ আল্লাহ্ পাকের কুদরতি ইশারায় সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো বীরবর খালিদের (رضي الله عنه) উপর। সুতরাং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকেই (رضي الله عنه) সর্বসম্মতিক্রমে সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁর হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে দেয়া হলো। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদের (رضي الله عنه) জিহাদে অংশগ্রহণ এটাই প্রথম। আর আল্লাহ্ পাকের অপার মহিমায় জীবনের প্রথম জিহাদেই পেলেন সেনাপতির মর্যাদা।

ইসলামের ঝাণ্ডা হযরত খালিদের (رضي الله عنه) হাতে যাওয়া মাত্রই মুজাহিদদের মাঝে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তন দেখা দিলো। কি এক অদৃশ্য শক্তিবলে তাঁরা শক্তিমান হয়ে উঠলো।

হযরত খালিদ (رضي الله عنه) এমন প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ পরিচালনা করলেন যে, দুশমন খৃস্টান সৈন্যরা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলো না। প্রথম দিনের যুদ্ধ বিরতির পর খালিদ (رضي الله عنه) গোটা মুজাহিদ বাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করলেন। সামনের মুজাহিদ পিছনে, পেছনের মুজাহিদ সামনে, ডানের মুজাহিদ বামে এবং বামের মুজাহিদ ডানে দাঁড় করালেন। শুরাহবিলের সৈন্যরা ময়দানে এসেই চমকে গেল। আরে এরাতো সব নতুন সৈন্য! তবে কি মদীনা থেকে রাতের আধারে নতুন সৈন্য সাহায্য এসে

পৌঁছেছে! এরূপ নানা আতংক ও ভয়-ভীতি আল্লাহ্ পাক দুশমনদের অন্তরে ছড়িয়ে দিলেন। যুদ্ধ পুনরায় শুরু হলো। হযরত খালিদের (রাঃ) সুনিপুন রণকৌশলে মাত্র দেড় দিনের ভিতরে যুদ্ধের রূপ পাল্টে গেল। এই দেড় দিনে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়তে লড়তে তাঁর মোবারক হাতে একের পর এক তরবারী ভাঙ্গতে থাকে। ছহীহ্ বুখারী শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী– হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বলেছেন, মূ'তার যুদ্ধের দিন আমার স্বীয় হস্তে নয়টি তরবারি ভেঙ্গেছে। কেবলমাত্র একটি ইয়ামেনী তরবারিই আমার নিকট অবশিষ্ট ছিল।

মূ'তার রণাঙ্গনে কখন কি ঘটছিল নবীজী (সাঃ) মদীনায় থেকে ওহী মারফত তার সবকিছু জানতে পারছিলেন। হযরত যায়েদ কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, তিনি কখন, কিভাবে শহীদ হলেন ; তাঁর পরে জাফর ঝাণ্ডা হাতে অগ্রসর হলেন। তার ডান হাত শহীদ হলো। বাম হাত শহীদ হলো। দু'পা শহীদ হলো। তিনি শেষ পর্যন্ত দাঁত দিয়ে ঝাণ্ডা কামড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন। দুশমনের আঘাতে তাঁর গর্দান উড়ে গেল। তিনি মর্মান্তিকভাবে শহীদ হয়ে গেলেন। এবার ঝাণ্ডা তুলে নিলো আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা; কিন্তু প্রাণপণ লড়ে সেও শহীদ হয়ে গেল প্রভৃতি এক একটি ঘটনা তিনি মদীনায় বসে শ্রোতৃবর্গকে শুনাচ্ছিলেন আর তাঁর নয়নযুগল হতে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরছিল। পরিশেষে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র তরবারী সমূহ হতে একটি তরবারি খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন।

রাসূল (সাঃ) মূ'তার যুদ্ধের ঘটনা একাধারে বর্ণনা করে চলেছেন মদীনায় বসেই। অপরদিকে মূ'তা প্রান্তরে হযরত খালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে প্রতিটি মুসলিম সৈন্য যথেষ্ট বীরত্ব ও সমর কুশলতা প্রদর্শন করে দুশমনদের রীতিমত নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়ছে। ফলে শত্রুসৈন্য ক্রমশ হাল ছেড়ে দিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করলো। অবশেষে হযরত খালিদের (রাঃ) মোবারক হাতেই ইসলামের ঝাণ্ডা বিজয়ীর বেশে উড্ডীন রইল। তিনি আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতে মুসলিম বাহিনীকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে বিজয়ী বেশে বিপুল পরিমাণ মালে গনিমতসহ মদীনার পথে রওনা করলেন।

নবীজী (ﷺ) ওহী মারফত পূর্বেই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আবগত হওয়ায় শহীদদের সন্তানদের উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে স্বয়ং বহুদূর অগ্রসর হয়ে জিহাদী কাফেলার বিজয়ী বীরদেরকে খোশ-আমদেদ জানালেন। অতঃপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে উপস্থিত জনতা ও কাফেলার মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন–

'হে আল্লাহ্র পথের মুজাহিদগণ! মূ'তার যুদ্ধে শহীদ তোমাদের ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব সম্পর্কে একটি সুসংবাদ শোন। তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় দু'টি হাত শহীদ করার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে দু'টি ডানা লাভ করেছেন এবং ঐ ডানার সাহায্যে তিনি ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন। [এজন্য নবী করীম (ﷺ) হযরত জাফরকে (رضي الله عنه) 'তাইয়ার' (উড়ন্ত), কখনোবা 'জুলজানাহাইন' (দুই পাখা বা ডানা বিশিষ্ট) নামে স্মরণ করতেন]। এছাড়া অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য আমি খালিদ বিন ওয়ালিদকে 'সাইফুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র তরবারি খেতাব ভূষিত করলাম।'

উপস্থিত জনতা মূ'তার যুদ্ধে স্বজন হারানোর শোক ভুলে গিয়ে নারা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে মিছিল সহকারে মদীনার রাজপথ ধরে ঘরে ফিরে চললো।

নারায়ে তাকবীর... আল্লাহু আকবার!
রাসূলে আরাবী, রাসূলে আরাবী... জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
জাফর তাইয়ার, জাফর তাইয়ার... জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
বীর খালিদ, বীর খালিদ... সাইফুল্লাহ! সাইফুল্লাহ!...

(মূ'তার যুদ্ধে জয়ের ফলে মুসলমানদের ভিতর নতুন করে জিহাদী উম্মাদনা ও প্রাণশক্তি জেগে উঠলো। পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের অন্তরে মুসলমানদের জিহাদী কাফেলার প্রতি এক চাঞ্চল্যকর ভীতি চিরদিনের জন্য স্থান করে নিলো।)

ঈমানে আজ ভাইরাস লেগেছে

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।'

—সূরা আল ইমরান : ১৯

আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা একমাত্র ঐ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যতের, যিনি দো-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি। আমরা মহাপরাক্রমশীল, মহিমান্বিত, মহাশক্তিধর, চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান ও বিচার দিনের মালিক আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালার নিকটই সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি কৃত গুনাহসমূহের জন্য। মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ দয়া তাঁর বান্দাদের প্রতি। যাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন লক্ষাধিক নবী ও রাসূল। অতঃপর সেই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন নবীয়ে রহমত, সাইয়্যেদুল মুরছালিন, খাতামুন্নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকে (ﷺ) এবং আমাদের মতো গুনাহগারদেরকে বানালেন তাঁর গর্বিত উম্মত। আর ইসলামকে মনোনীত করলেন একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হিসেবে। অর্থাৎ কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রেই দ্বীন হিসেবে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। তাই যদি কেউ নিজস্ব ধ্যান-ধারণাপ্রসূত কোন বিষয়কে ইসলামের বিকল্প বা পরিপূরক হিসেবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে সে স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্টদের দলে শামিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী থেকেও সে/তারা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার থাকে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে সেতো স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্ট হবে।' (সূরা আল আহ্‌যাব : ৩৬)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেন—

'...আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (হে মুহাম্মদ (ﷺ)) আমি আপনাকে তাদের জন্য জিম্মাদার করে পাঠাইনি।' (সূরা আন নিসা : ৮০)

অথচ আফসোস! হায় আফসোস! আমাদের ঈমান আজ ভাইরাসে আক্রান্ত। যে কারণে আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণাও আমাদের মনকে ভীত করছে না, করছে না গোমরাহী মুক্ত। মানব সৃষ্ট ধ্যান-ধারণা তাই আজ আমাদের পথ ও পাথেয়। লাগামহীন মুনাফেকী আচরণ আজ আমাদের একমাত্র সম্বল। আজ আমরা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র নিকট নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসেব দেয়া নিয়ে ততটা চিন্তিত নই যতটা চিন্তিত দুনিয়ার ভোগ বিলাসের উপাদান ধন-সম্পদ আহরণ করা নিয়ে। অন্যায়-অত্যাচার, জোর-জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে কিংবা কাফির-মুরতাদদের বিরূদ্ধে আজ আমাদের তলোয়ার আর গর্জে ওঠে না। জিহাদকে আজ সন্ত্রাস মনে হয়। এর চেয়ে বরং ভালো লাগে গায়ে আতর মেখে, চোখে সুরমা দিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, হাতে মেসওয়াক আর শরীরে জুব্বা চড়িয়ে নফ্সের জিহাদে দিন গুজরান করতে। আজ আমাদের সম্মুখে অসংখ্য বান্দার হক্ব, আল্লাহ্র হক্ব, ফরজ-ওয়াজিব আদায় হওয়ার প্রতীক্ষায় পড়ে আছে অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুস্তাহাব সম বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাহাস-মুনাজারা, লাঠালাঠি করে আপন মুসলমান ভাইয়ের খুন ঝরাতে দ্বিধাবোধ করছি না। যেমন একদল নিয়মিত নামায পড়ে, আরেক দল পড়ে না; কিন্তু তাদের মধ্যে অনিয়মিত নামায আদায়কারী দল অপর দলের নামাযে 'সশব্দে আমীন' বলা নিয়ে বাহাসের ডাক দিয়ে বসলো আর কি! নিজেরা নামায না পড়ে কবীরা গুনাহে লিপ্ত আছে তার খবরই নেই! অথচ নামাযের ফরজ-ওয়াজিবের মধ্যে গণ্য নয় এমন বিষয় নিয়ে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য ঠিকই উঠে পড়ে লেগে গেছে। ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হালাল রুজী। হারাম আহার দ্বারা বেড়ে উঠা শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অথচ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সুদ-ঘুষে আপাদমস্তক জর্জরিত। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাবে সামাজিক জীবনেও সুদ-ঘুষ-জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত ঘৃণ্য আয়কে বৈধ মনে করা হচ্ছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেশের মানুষ সুদ-ঘুষ-জুয়ার ন্যায় হারাম উপার্জনে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে সরকারী-বিরোধী দল, বামপন্থী, এন.জি.ও-কাদিয়ানী-মিশনারী প্রভৃতি বহুমুখী আক্রমণে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ আজ বিপন্ন; কিন্তু তা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। কারণ, আমরাতো দ্বীন দরদী নই, আতর-লেবাসে আসক্ত পেট পূজারী। যে কারণে একদল ব্যস্ত গলাবাজিসমৃদ্ধ ইসলামী আন্দোলন নিয়ে, আরেক দল

ব্যস্ত ইসলামী গণতন্ত্রের নামে নিজের আখের গোছাতে। এই ফাঁকে তথাকাথিত প্রগতিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, দুর্বুদ্ধিজীবী, কাদিয়ানী, মুরতাদ, যিন্দিকরা কিন্তু ঠিকই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদে বসে পড়ছে। তারা ঈমানদার মুসলমানদের ন্যায় এতটা বোকা নয় যে, নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি করে অন্যকে গদি দখলের সুযোগ করে দিবে। তারা অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পেরেছে যে উপরওয়ালা (আল্লাহ্) যদি তুরস্কের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেন তবে সহসাই এদেশের মুসলমানদের মোহমুক্তি ঘটবে না, কাজেই যতদিন সম্ভব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে দোষ কি! সুতরাং আজ আমরা এদেশের মুসলমানরা যে ইসলামকে ধারণ করে আছি একে অন্ততঃ মুহাম্মদী ইসলাম বলা চলে না কারণ এর সাথে কুরআনী শিক্ষার কোন মিল খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। বরং একে বলা চলে রাজতন্ত্রী, ধনিক-বণিক, হারামখোর শাসক, শোষক শ্রেণী ও তাদের দক্ষিণা ভোগীদের কবর জিয়ারত, জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বাষিকী, খতমে ইউনুস, খতমে খাজেগান, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ, মাইকে শবীনা খতম, আতর-সুরমা, ফার্সী-আরবী নাম, সুন্নতে খত্না, বিশা-তিরিশা-চল্লিশা-কুলখানী মার্কা সমাজের পরগাছাদের হালুয়া-রুটির ইসলাম। যে আল্লাহ্ মুহাম্মদ মুস্তফাকে (ﷺ) আমাদের জন্য রহমত ও মুক্তির উসীলা হিসেবে প্রেরণ করলেন আমরা কি তাঁর সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পেরেছি? তাঁর আনীত কুরআন যে মৌল-মানবিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলীর ভিত্তিতে একটি সফল বিপ্লব পরিচালনার রূপরেখা আমাদের সম্মুখে রেখে গেছে তার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কি আমরা কায়েমের উদ্যোগ নিয়েছি? –প্রশ্নগুলো স্বগতোক্তি ধরনের শুনালেও এর উত্তর আমাদের সবারই জানা। তাই হয়তো জনৈক মনীষী বলেছিলেন–'মুহাম্মদ (ﷺ) আজ আমাদেরকে দেখলে নির্ঘাৎ কাফের বলতেন আর আমরা তাঁকে দেখলে পাগল বলতাম।'

রাসূলুল্লাহ্‌র (ﷺ) আবির্ভাবকালীন আরব জাহানের অবস্থার সাথে আমাদের বর্তমান অবস্থার কি কোন তফাৎ আছে? আমাদের বর্তমান অবস্থাকে যদি খুব বেশী উন্নততর পর্যায় থেকেও বিবেচনা করা হয়, তবে তা হবে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ভাষায় তৃতীয় শ্রেণীর ঈমানদারের ন্যায়,

যারা ইসলাম বিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শহীদ হওয়ার বদলে ঈমান ও জান রক্ষার দোহাই দিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নী মনোভাব অর্থাৎ বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। আজ আমাদের মাঝে যদিওবা কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক দল ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধানরূপে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে রত কিন্তু তাদেরও অধিকাংশই বাগদাদী, দামেস্কী, ইরানী, কুয়েতী ও সৌদী তথা রাজতন্ত্রী শাসক ও শোষক শ্রেণীর অর্থানুকূল্যে ও স্বার্থানুকূল্যে নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত ইসলামের তল্পিবাহক। এরা একদিকে যেমন ইসলামী খেলাফতের কথা বলছে অপরদিকে তেমনি ঐসব রাজতন্ত্রী শোষকদের কপোলে কপোল ঘষে ধন্য হচ্ছে। এই যখন শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জনগণের অবস্থা তখন ঈমান ও মুসলিম জাতির হেফাজতে দেশের হক্বপন্থী পীর-মাশায়েখদের এগিয়ে আসা ছিল একান্ত জরুরী। অথচ তারাও সঠিক দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছেন। যে কারণে দেশে আজ মুসলমানদের জন্য গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো অর্ধশতাধিক লক্বধারী (উপাধিধারী) পীরের আবির্ভাব ঘটছে, কেউবা গ্যারান্টি সহকারে ক্বালব যিন্দা করে দিচ্ছে, জিকির-আয্‌কারের নামে নেশা-ভাং খেয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করা তরিকা পয়দা হচ্ছে, শরীয়ত-মারেফতের নামে কবর পূজা, পীর পূজা, পীরের মাজার পূজা, পীরের কবর তাওয়াফ করা, পীরের নামে মানত করা, সওয়াবের আশায় পশু ছেড়ে দেয়া, পীরের পা চাটা, আঙ্গুল চোষা, পীরকে বিপদে-আপদে স্মরণ করা, পীর গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস রাখা, দেলে দেলে নামায পড়া, মেয়েদের মতো লম্বা চুল ও জট রেখে ফকীর-দরবেশ সাজা, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরীর (রহ.) নামে গান-বাজনার আয়োজন করা প্রভৃতি নাজায়েয কুফ্‌রী ও বাতিল আক্বীদার প্রচার ও প্রসার ঘটছে। মূলত এরা পীর বা ওলী নয়, ওলী নামের হাইজ্যাকার। এদের প্রধান কাজই হচ্ছে নগদ নারায়ণীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদাকে ধ্বংস করা। আর এদের শিক্ষা দেওয়া মারেফত মু'মিনের জন্য মরার পথ। আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিজের জান-মাল কুরবানী করার পরিবর্তে দ্বীন ইসলামকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের মত ঘৃণ্য কাজে এরা লিপ্ত আছে। এরাই হচ্ছে উলামায়ে ছু' বা অসৎ আলেম। আল্লাহ্‌র দ্বীনের ঝাণ্ডার পরিবর্তে নিজস্ব মত-পথের নিশানকে সমুন্নত রাখতেই তাদের যত

চাতুর্যপূর্ণ বয়ান। কালের বিবর্তনে মসজিদে জামাতে নামাযের ইমামতি আজ পেশায় রূপ নিয়েছে। এই সুযোগে সমাজের বিত্তবান, সম্পদশালী অথচ অনিয়মিত নামায আদায়কারী, সুদখোর, ঘুষখোর, জুয়াড়ী, যেনাকারী লোকজনও শুধুমাত্র সামাজিক প্রভাবের কারণে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য, ক্ষেত্রবিশেষে সভাপতি পদ পর্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। এরাই আলেমদেরকে ইমাম (নেতা) হিসেবে সম্মান করার পরিবর্তে তাদের সাথে কর্মচারীর ন্যায় আচরণ করেন। ইসলামের দাবী ছিল সমাজের সবচেয়ে আল্লাহ্ওয়ালা লোক ইমাম হবেন; কিন্তু যেহেতু ইমামতিকে চাকরির পদ ভাবা হয়, সেহেতু আল্লাহ্ওয়ালার পরিবর্তে মসজিদ কমিটির পায়রবি করা আলেমকে (প্রয়োজনে দূর শহর-গ্রাম হতে সংগ্রহ করে) ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। এই আলেমরাই সামান্য রুটি-রুজীর মায়ায় আল্লাহ্র হুকুমের পরিবর্তে মসজিদ কমিটির হুকুমের পায়রবি করছে। আল্লাহ্র কাছে হিসাব দেয়ার ভয় তাদের মধ্যে অতটা কাজ করে না, যতটা কাজ করে চাকরী চলে যাওয়ার ভয়। অতএব, শুধু সমালোচনা নয়; দেশে শান্তি চাইলে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) রেজামন্দি হাসিল করতে চাইলে আমাদের এ অমূল্য জিন্দেগীকে নশ্বর দুনিয়ার পদতলে সঁপে না দিয়ে আল্লাহ্ প্রেরিত মহামানব, উম্মতের কাণ্ডারী, হিদায়াতের ঝাণ্ডাধারী, বিশ্বশান্তির প্রবর্তক, তাগুতী শক্তির মূল্যেৎপাটনকারী, মূর্তি ধ্বংসকারী, সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, যেনা-ব্যভিচার নিশ্চিহ্নকারী, অসহায়-নিগৃহীত, অধিকার বঞ্চিত নারী জাতির মুক্তি ও সম্মান পুনরুদ্ধারকারী ও প্রতিষ্ঠাকারী, পয়গামে হক্বের ধারক-বাহক, সরদারে দো-জাহান, সারোয়ারে কায়েনাত, ইমামুল মুরছালীন, সাইয়্যেদুল মুরছালীন, খাতামুন্নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর আনীত শরীয়ত এবং প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করতে হবে। কারণ, মুসলমানদের ঈমানে আজ যে ভাইরাস আক্রমণ করেছে তার জন্য কার্যকর একমাত্র এন্টিবায়োটিক হচ্ছে আল-কুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ্। তাই আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কুরআন এবং সুন্নাহ্ মোতাবেক চলার তাওফিক দিন। আর নিজ নিজ ঈমানী ভাইরাস দূর করে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্তদের দলে কবুল করে নিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আ'লামীন ॥

বিদ্‌'আত ও এর উৎপত্তির কারণসমূহ

বিদ্‌'আত-এর অর্থ ঐ মত, বস্তু বা কর্মপ্রণালী যার অনুরূপ কোন কিছু পূর্বে বর্তমান ছিলনা বা সম্পাদন করা হয়নি; নব প্রবর্তন বা অভিনবত্ব। অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে নতুনভাবে উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত নব কোন বস্তু বা বিষয়। মুফরাদ-এ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বিদ্‌'আত শব্দের অর্থ লিখেছেন–

'কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে উদ্ভাবন করা।'

শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্‌'আত হচ্ছে– দ্বীন ইসলামের স্বীকৃত উৎসগুলির (কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস) সাথে যে সকল নব প্রবর্তিত ধর্মীয় নৈতিক বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নেই এবং মুসলিম সমাজে এমন যে সব নতুন ধারণা ও রীতি-নীতির উদ্ভব করা হয় যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আমল-আখলাকের সাথে খাপ খায় না। বিশদভাবে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم), তাবেঈন (রহ.) ও তাবে তাবেঈনগণ (রহ.)-এর পর নতুন ভাবে সৃষ্ট এমন বিষয় বা কাজ যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি বা করার নির্দেশ দেননি, না স্পষ্টভাবে না ইঙ্গিতাকারে অথচ সেই বিষয় বা কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা, দ্বীনের অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা, সওয়াব লাভ ও আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যলাভের উপায় মনে করে সেই ধরনের কাজ করা এমনকি এর স্বকল্পিত আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এর জন্য কিছু মনগড়া শর্ত ও বিধির প্রবর্তন করা এবং শরীয়ত সম্মত কোন কাজ বা নির্দেশের মত এটিরও পাবন্দী করা বা এটিকে নিয়মানুবর্তিতার সাথে আমল করে যাওয়ার নামই হল বিদ্‌'আত।

বিদ্‌'আত সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত আলেমে দ্বীনের মন্তব্য :

۞ আল্লামা ইউসুফ কান্দালভী (রহ.) : এমন বিষয় যা দ্বীনের মধ্যে অভিনব। শরীয়তে যার ভিত্তি নেই, মৌলিক সমর্থন নেই, শরীয়তের পরিভাষায় তারই নাম হচ্ছে বিদ্‌'আত।

۞ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) : ঐ সমস্ত নব আবিষ্কৃত কাজ যা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ), আচারে সাহাবা (رضي الله عنهم) এবং ইজমায়ে উম্মাতের বিপরীত তাই শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্‌'আত, যা বর্জনীয়।

۞ আল্লামা শিহাবউদ্দীন আফেন্দী (রহ.) : শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্‘আত হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের (ﷺ) পরে দ্বীন ইসলামের কোন জিনিস বাড়িয়ে দেয়া কিংবা হ্রাস করা, যে সম্পর্কে নবী করীম (ﷺ)-এর তরফ থেকে বা কাজের দিক দিয়ে স্পষ্ট কোন অনুমতিই পাওয়া যায় না।

۞ হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) : বিদ্‘আত হচ্ছে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত সুবিদিত বিষয়াদির বিপরীত, নতুনভাবে উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা বা আমল করা, যেগুলো কোন ধরনের অবাধ্যতা নিয়ে নয় ; বরং কোন প্রকারের সন্দেহের প্রেক্ষিতে উদ্ভাবন করা হয়।

۞ প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইমাম খাত্তাবী (রহ.) : যে মত বা নীতি দ্বীনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা শরীয়তে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই এবং যা কিয়াস দ্বারাও সমর্থিত নয়, এমন যা কিছুই নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয় তাই বিদ্‘আত।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণীত হয় যে, সেই সকল কাজ বা আমলই গ্রহণযোগ্য এবং উত্তম বলে বিবেচিত যা সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) ও তৎপরবর্তী দুই স্বর্ণযুগের লোকেরা করেছেন। অপরদিকে খাইরুল রুকন তথা তিন স্বর্ণযুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা এবং যাদের ইজাতিহাদের যোগ্যতা নেই তারা কোন কিছু উদ্ভাবন করে তা উত্তম বলে সাব্যস্ত করলেই তা উত্তম বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার আওতায় পড়বে কিংবা কোন স্পষ্ট দলীল তার স্বপক্ষে থাকবে। সুতরাং যে সকল নব উদ্ভাবিত কাজের স্বপক্ষে কোন স্পষ্ট দলীল নেই কিংবা তা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার আওতাধীনে পড়ে না নিঃসন্দেহে সেগুলো বিদ্‘আত বলেই বিবেচিত হবে। মানুষ তা যতই ভাল মনে করুক না কেন। তবে ঐসকল নব আবিস্কৃত বিষয়কে বিদ‘আত বলা সঠিক হবে না, যেগুলো ইবাদাতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইবাদাতের অঙ্গ বা অংশ নয়, ব্যবহারকারী কেউ তা মনেও করে না। যেমন নক্‌শাদার টুপি, জায়নামায, পাশে কাটা পাঞ্জাবী, রঙিন রুমাল, ইমাম-মুয়াজ্জিন কর্তৃক নামাযে মাইক, লাউড স্পিকার ব্যবহার প্রভৃতি।

বিদ্‘আত উদ্ভাবনের কারণসমূহ :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কিন্তু তা সত্ত্বেও এর অনুসারীরা বিদ্‘আত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বিদ্‘আত উদ্ভাবনের প্রধান এবং প্রথম কারণ হচ্ছে মূর্খতা। সাধারণ মানুষের নিকট বিদ্‘আতী কর্মসমূহ আপাত দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় বলে মনে হয়। তাই শরীয়ত সম্পর্কে অনবহিত সাধারণ লোকেরা এর প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা এটাতো খুব সুন্দর কাজ। শরীয়তে এ কাজ কোন্ যুক্তিতে নিষিদ্ধ হতে পারে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞতা এবং বাহ্যিক পছন্দের মাপকাঠির ভিত্তিতে তারা সুন্নতের তুলনায় বিদ্‘আতের দিকেই অনেক বেশী ঝুঁকে পড়ে। ফলে বিদ্‘আতের অন্তর্নিহিত মন্দ দিকের প্রতি তাদের নযর পড়েনা মোটেই। মূলত জনসাধারণের এ মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা সম্মন্ধে বিদ্‘আতীরা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকার কারণে অতি সহজেই নিত্য-নতুন বিদ্‘আত উদ্ভাবনের সুযোগ পেয়ে যায়।

(২) বিদ্‘আত উদ্ভাবনের দ্বিতীয় কারণ হলো শয়তানের অপকৌশল এবং প্রতারণা। কেননা একথা সকলেই অবহিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত দ্বীন ও তাঁর সুন্নাহর প্রতি শয়তানের শত্রুতা চিরকালের। কারণ, রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর তরীকাই হিদায়াতের একমাত্র পথ। শয়তান জানে ধোঁকা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করলেও তারা তাওবার মাধ্যমে সে পথ থেকে সম্পূর্ণরূপে পাকসাফ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। তাই সরল বিশ্বাসী মুসলমানদের সত্য ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান ও তার দোসর বিদ্‘আতের এমন পন্থা উদ্ভাবন করে থাকে যা সাধারণ লোকেরা সওয়াবের কাজ মনে করে এবং নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করার দিকে অগ্রসর হয়। এতে তারা সওয়াবতো পায়ইনা বরং উল্টো গুনাহের অংশীদার হয়। বস্তুত শয়তান একসময় ফিরিশতাদের উস্তাদ ছিল। নাজায়িযকে জায়িয এবং হারামকে হালাল হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থাপনের ফন্দি-ফিকির তার ভালভাবে রপ্ত করা আছে। এছাড়া সে একজন মনোবিজ্ঞানীও বটে! সুতরাং কোন্ শ্রেণীর মানুষকে কোন্ পথে গোমরাহ করতে হয় তার সব কলা-কৌশল শয়তানের খুব ভাল করে জানা আছে। আর ঐ সব কলা-কৌশল অবলম্বন করেই শয়তান কুরআন-হাদীস বহির্ভুত কাজকে ধর্মের লেবাস পরিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে। ফলে

কিছু মানুষ কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নব উদ্ভাবিত বিদ্'আতকে মহা সওয়াবের কাজ মনে করে আনন্দচিত্তে তা করতে থাকে। একই কারণে এরা জীবনে কখনো তওবার প্রয়োজন অনুভব করেনা এবং তওবাও তাদের নসীব হয় না।

(৩) বিদ্'আত সৃষ্টির তৃতীয় কারণ হলো, সুনাম-সুখ্যাতি আর পদমর্যাদার মোহ। মানুষ স্বভাবতই নতুনকে ভালবাসে এবং নতুনত্বের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাই সমাজের সম্মানী, লোভী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে, যাতে তাদের সুনাম সৃষ্টি হয় এবং সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

(৪) বিদ্'আত সৃষ্টির চতুর্থ এবং অন্যতম কারণ হলো, বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। তাহযিব-তমদ্দুনের ক্ষেত্রে স্বভাবজাত নিয়ম হচ্ছে – কোন জাতির মধ্যে যখন ভিন্ন সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন এক সভ্যতা অন্যটিকে অবলীলাক্রমে প্রভাবিত করে। আর যে জাতি স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির হিফাজত করতে পারে না সে জাতির আদর্শ ও উত্তম গুণাবলী ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে তারা বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

মুসলমান জাতি যতদিন পর্যন্ত ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান ছিল এবং নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথাযথ সংরক্ষণ করে আসছিল ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার অপরাপর সভ্যতা ছিল তাদের সামনে পদানত ও পরাভূত; কিন্তু যখনই মুসলমানগণের ঈমানী শক্তি দুর্বল হয়ে গেল এবং নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণে অমনোযোগী হলো ঠিক তখনই ঘটলো বিজাতীয় সভ্যতার অনুপ্রবেশ, ক্রমশ যার প্রভাবে মুসলমানরা প্রভাবিত হতে লাগলো। আজকের মুসলিম উম্মাহর অন্ধ পাশ্চাত্য অনুসরণ-অনুকরণ মূলত এরই ফল। এ অন্ধ অনুকরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে শেষ পর্যন্ত বিধর্মী-বিজাতীয়দের রুসম-রেওয়াজসমূহ মুসলমানদের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে, কালের প্রবাহে একসময় তা ধর্মীয় বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং মুসলমানদের অনেকেই সওয়াবের কাজ মনে করে তা করতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয় এসব কাজের বৈধতার পক্ষে দলীল পেশ করার মতো দুঃসাহস এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতেও তারা পিছপা হচ্ছে না। যেহেতু বিভিন্ন দেশের সভ্যতাও ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু একেক অঞ্চলের বিদ্'আত একেক ধরনের হয়ে থাকে।

একথা অনস্বীকার্য যে, এ উপমহাদেশে সুফিসাধকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ই ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এখানকার নওমুসলিমদের যথাযথ তালীমের ব্যবস্থা হয়নি। ফলে যারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা অধিকাংশই তাদের সাবেক সমাজের রুসম-রেওয়াজকে পুরোপুরি ভুলতে বা ত্যাগ করতে পারেনি। তাই অদ্যাবধি আমাদের মুসলিম সমাজে বিশেষ করে বিবাহ-শাদী ও জন্ম-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এমন কতিপয় বিদ'আত প্রচলিত আছে যার অধিকাংশই হিন্দু সমাজ হতে আগত। বিশ্বের অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন বিদ্'আত গুলোর উৎপত্তির কারণও ঠিক এভাবেই বিশ্লেষণ করা যায়।

(তথ্যসূত্র: ইখতিলাফুল উম্মাহ্ ১/৮৭-৯০, ফাতাওয়ায়ে সিদ্দিকীন ৩/৯৮-১০০)

বৃহৎ ত্যাগ যেমন খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়
ক্ষুদ্র ত্রুটি তেমন পতনের অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে। –আকিক

মুহাররম ও আশুরা : ফজিলত ও সুন্নত

মহান আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত অসীম করুণা ও রহমত তার বান্দার জন্য। তিনি বিভিন্ন মৌসুমকে যেমন বিভিন্ন ফল-ফসলের উৎকৃষ্ট উৎপাদনের জন্য উপযোগী করেছেন ঠিক তদরূপ ইবাদত বন্দেগীর জন্যও কিছু কিছু সময়ের (মাসের) মধ্যে খাস রহমত ও বরকত রেখেছেন। যদি কোন মুসলমান সেই বিশেষ সময়ে আন্তরিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ্র (ﷺ) সুন্নত মোতাবেক আমল করে, তাহলে সে এর বিনিময়ে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ ঐ বরকতময় সময়ে সামান্য চেষ্টা ও মেহনত দ্বারা দো-জাহানের অশেষ নেকী অর্জন করা যায়।

মহান আল্লাহপাক তাঁর মহব্বতের বান্দাদের জন্য চারটি মাসকে সম্মানিত ও পবিত্র মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মাস চারটি হচ্ছে : জিলক্বদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। এই মাস চারটি অত্যন্ত মর্যদা ও ফজিলতপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহ্র বিধান ও গণনায় মাস বারোটি। তন্মধ্যে চারটি বিশেষভাবে সম্মানিত মাস এবং তাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এই মাসগুলোতে পাপাচার করে নিজেদের ওপর জুলুম করো না।' (সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬)

মহান আল্লাহ্ পাক ঘোষিত চারটি সম্মানিত মাসের একটি মুহাররম। এছাড়া আরবী অর্থাৎ হিজরী বর্ষের প্রথম মাসও মুহাররম এবং এই মুহাররম মাসেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে কারণে সব মিলিয়ে এ মাসটি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এক মহা ফজিলতপূর্ণ মাস হিসেবে বিবেচ্য। আমাদের প্রিয় নবী, আখেরী রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন– 'তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রিয় মাস মুহাররমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। যে ব্যক্তি এরূপ করবে (অর্থাৎ ঝগড়া, ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকবে), আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতে সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত রাখবেন।'

অপর এক হাদীসে বলেছেন– 'যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনকে নিজের জন্য হারাম করতে চায়, সে যেন মুহাররম মাসে নফল রোযা রাখে।'

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আরও বলেছেন– 'রমযানের রোযা ব্যতীত মুহাররমের রোযাই হলো শ্রেষ্ঠ রোযা এবং ফরয নামায ব্যতীত তাহাজ্জুদের নামাযই হলো শ্রেষ্ঠ নামায।' (সহীহ্ মুসলিম শরীফ)

এই মহা ফজিলতপূর্ণ মাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি হলো আশুরার দিন অর্থাৎ দশই মুহাররম। আমরা অনেকেই এই দিনটিকে কারবালায় সংঘটিত সেই মর্মান্তিক, হৃদয় বিদারক ও দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতেই স্মরণ করে থাকি। অথচ সৃষ্টির শুরু থেকেই এই দিনটি বহু গুরুত্বপূর্ণ, বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এ দিনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে :

۞ পবিত্র এই দিনে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু লওহে মাহ্ফুজ ও সকল সৃষ্ট জীবের রূহ সৃষ্টি করেছেন।

۞ দুনিয়ার সমস্ত নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর এবং পাহাড়-পর্বতও এই দিনেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

۞ মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (عليه السلام)-কে আল্লাহ্ পাক এই দশই মুহাররমেই সৃষ্টি করেছিলেন, জান্নাতে দাখিল করেছিলেন এবং এই দিনেই আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেছিলেন।

۞ এই মহিমান্বিত দিনে হযরত নূহ (عليه السلام) তাঁর স্বল্প সংখ্যক ঈমানদার উম্মত নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কিস্তিতে আরোহণ করে তুফান ও জলোচ্ছাস হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

۞ এই দিনে মহান আল্লাহ্ পাক হযরত ইবরাহীম (عليه السلام)-কে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই দিনেই হযরত ইবরাহীম (عليه السلام) নমরুদের অগ্নিকুণ্ডের থেকে নাজাত পেয়েছিলেন।

۞ হযরত মূসা (عليه السلام) এর সঙ্গে তুর পর্বতে আল্লাহ্ পাকের কথোপকথন হয়েছিল এবং তিনি তওরাত কিতাব লাভ করেছিলেন এই দিনেই। এছাড়া এ দিনেই মূসা (عليه السلام) এর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে জাহান্নামের কীট ফেরআ'উন সদলবলে নীল দরিয়ায় ডুবে ধ্বংস হয়েছিল।

۞ হযরত আইয়ুব (عليه السلام) এই দিনে রোগ হতে শেফা লাভ করে ধন-সম্পদ ফিরে পেয়েছিলেন।

۞ হযরত ইয়াকুব (عليه السلام) আল্লাহ্র দরবারে বহু কান্নাকাটির পর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইউসুফ (عليه السلام)কে ফিরে পেয়েছিলেন এই দিনে।

- আশুরার এই দিনে আল্লাহ্ পাক হযরত ইউনূস (عليه السلام) কে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেছিলেন।
- এই দিনে হযরত দাঊদ (عليه السلام) মহান আল্লাহ্ পাক কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হযরত সুলায়মান (عليه السلام) পুনরায় রাজত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।
- এই মহাপবিত্র দিনে হযরত ঈসা (عليه السلام) পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এবং এই দিনেই মহান আল্লাহ্ পাক তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।
- হযরত জিবরাঈল (عليه السلام) এই দিনেই আল্লাহ্‌র রহমত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।
- এই মহিমান্বিত দিবসেই আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত সর্বপ্রথম পৃথিবী সৃষ্টি এবং আসমান হতে এত রহমতের বাবিধারা বর্ষণ করেছিলেন।
- দশই মুহাররমের এই দিনে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর স্নেহধন্য প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (رضي الله عنه) তার ৭২ জন সঙ্গী সহচরসহ কারবালার ময়দানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য হক্বের পক্ষে সংগ্রাম করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।
- মুহাররমের দশ তারিখের কোন এক শুক্রবারেই ইসরাফিল (عليه السلام)-এর শিঙ্গার ফুৎকারে পৃথিবীতে কিয়ামত সংঘটিত হবে। (উমদাতুল ক্বারী ১১শ খন্ড)

মহাপবিত্র ফজিলতপূর্ণ মুহাররম মাসের দশম তারিখ আমুরার দিনের উল্লেখিত ঘটনাবলীর আলোকে আমাদের কি করা উচিত, আর কিইবা আমরা করছি তা অন্ততঃ একবার হলেও আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এই মহিমান্বিত দিবসে দু'টি কাজ করা বিশেষভাবে আখেরী রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর খাস সুন্নত। কাজ দু'টি হচ্ছে– এইদিনে পরিবারের জন্য সামর্থানুযায়ী বেশী ব্যয় করা এবং নফল রোযা রাখা। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ﷺ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আশুরার দিন রোযা রেখো কিন্তু ইহুদীদের বিরোধিতা করো। আর তা এভাবে যে, আশুরার দিন রোযা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দিনেও রোযা রেখো।' (মুসলিম শরীফ)

অপর এক হাদীসে এসেছে, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) চারটি জিনিস কখনো পরিত্যগ করেননি– (১) আশুরার দিনের রোযা (২)

জিলহজ্জ্ব মাসের দশ দিনের রোযা (৩) প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা এবং (৪) ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত নামায।' (নাসাঈ শরীফ)

নবী করীম (ﷺ) আরও ইরশাদ করেছেন, 'আশুরার দিন যে ব্যক্তি নিজ পরিবারর্গকে তৃপ্তি সহকারে খানা খাওয়াবে, বস্ত্র পরিধান করাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে সারা বৎসর তৃপ্তি সহকারে খাওয়া ও পরিধান করার সুব্যবস্থা করে দিবেন।' (বাইহাকী শরীফ)

অথচ আফসোস! মহা আফসোস ! আমাদের সমাজের বহু সুন্নী মুসলমান উল্লেখিত সুন্নত সম্পর্কে গাফিল থাকার কারণে শিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় আশুরার দিনে তাজিয়া সহকারে মিছিল বের করে, জারিগান গায়, লাঠি খেলার আয়োজন করে, বুক চাপড়িয়ে মাতম করে এবং শিরনী/তবারক বিতরণ করে যা নিঃসন্দেহে গোমরাহীমূলক বিদ্‌আ'ত। অবশ্য কম বুঝ সুন্নীদেন মাঝে এ সকল শিয়া ফেৎনা অনুপ্রবেশ করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত আছে শিয়াদের ভাড়া করা পদলেহনকারী কিছু সুন্নী নামধারী দুনিয়দার পীর ও ইমাম। অতএব, আমাদের সকলের উচিত হবে, মহাফজিলতপূর্ণ মুহাররম মাসে আল্লাহ্‌র খাস রহমত-বরকত হাসিলের জন্য সঠিক পন্থায় বেশী বেশী ইবাদাত-বন্দেগী করা এবং পবিত্র আশুরার দিনের সাথে সম্পৃক্ত সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মরণে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে দোয়া-খায়ের করা। আর দেশের প্রতিটি জনপদে মজলিসের আয়োজন করে তাতে মুহাররম ও আশুরার সঠিক তাৎপর্য তুলে ধরে আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় কী সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে মহাপবিত্র, বরকতময় ও ফজিলতপূর্ণ মুহাররম মাসের প্রতি সঠিক সম্মান প্রদর্শনের তৌফিক দান করুন এবং মুহাররম ও আশুরার পরিপূর্ণ রহমত ও বরকত লাভে ধন্য করুন। আমীন।।

ঈদুল ফিত্‌র ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই উচ্ছলতা, ঈদ মানেই ভালোবাসা আর ত্যাগের অনুপম মেলবন্ধন। ঈদ সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঘরে ঘরে বয়ে আনে নির্মল আনন্দ, পরিবর্তন আর নূতনত্বের সওগাত। ঈদের আগমনে ধনী-দরীদ্র, সাদা-কালো, বড়-ছোট, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানই আনন্দিত হয়। কেউ নামায পড়ে, কেউবা পড়ে না; কেউ রোযা রাখে, কেউবা রাখে না; কেউ যাকাত দেয়, কেউবা তা নেয়; কিন্তু ঈদ করেনি বা ঈদের আগমনী বার্তায় আনন্দিত হয়নি এমন মুসলমান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর তাই ঈদ সারা বিশ্বের মুসলমানদের নিকট এক সার্বজনীন আনন্দ উৎসব।

ঈদুল ফিত্‌র। ঈদ অর্থ আনন্দ, উৎসব। ফিত্‌র শব্দটির অর্থ ভাঙ্গা, শেষ করা, অবসান ঘটানো। অর্থাৎ, ঈদুল ফিতর হচ্ছে রমযানের রোযা অবসানের বা ভাঙ্গার আনন্দ বা উৎসব। রমযানকে বিদায় জানিয়ে সাঁঝের আকাশে উঁকি মারে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ। রমযানের দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর শাওয়ালের পহেলা দিনটিই ঈদুল ফিতর। আজ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জিয়াফত ও দাওয়াতের দিন। আজ রোযা রাখা যাবে না। আজ রোযা রাখা ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক সুস্পষ্ট হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকের দিনে আমাদের সবাইকে ভেদাভেদ ভুলে মহান আল্লাহ্‌ পাকের দাওয়াতে সাড়া দিতে হবে। আজ তিনি তাদেরকেই পুরষ্কৃত করবেন, যারা সিয়াম সাধনা করেছে, রাত জেগে ইবাদত করেছে, তারাবীহ পড়েছে, আল্লাহ্‌র যিকির করেছে, সর্বোপরি তাঁর হুকুম মেনে চলেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

'শবে ক্বদরে জিবরাঈল (আঃ) একদল ফেরেশতাসহ অবতরণ করেন। তারা প্রত্যেকে এমন বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দু'আ করেন, যে দাঁড়িয়ে ও বসে আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকে। এরপর ঈদের দিন রোযাদার বান্দাগণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করে বলেন– ফেরেশতাগণ, বলোতো সেই মজুরের কী প্রতিদান হবে, যে তার কাজ পূর্ণ করেছে? ফেরেশতাগণ বলবে–হে পরওয়ারদেগার! তার প্রতিদান

হচ্ছে তাকে তার কাজের পুরোপুরি বদলা দিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ বলেন- ফেরেশতাগণ আমার বান্দারা তাদের অপরিহার্য কর্তব্য পূর্ণ করেছে। এখন কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করার জন্য (ঈদগাহের উদ্দেশে) বের হয়েছে। আমার ইজ্জতের কসম, মর্যাদার কসম, আমি অবশ্যই তাদের দু'আ কবুল করবো। অতঃপর বান্দাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন- আমি তোমাদের ক্ষমা করলাম এবং তোমাদের অসৎ কর্মসমূহ সৎকর্মে রূপান্তরিত করলাম। এরপর বান্দারা ঈদগাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।' (বায়হাকী)

মহান আল্লাহ্পাক এ দিনটিকে বান্দাদের জন্য 'পুরস্কারের দিন' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

'ঈদুল ফিতরের দিন ফেরেশতাগণ ঈদগাহে গমনাগমনের পথে বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা করতে থাকেন, হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আপন করুনাময় মহান রবের দরবারে উপস্থিত হও। তিনি আপন দয়া ও মেহেরবাণীতে নেক আমল ও ইবাদতের তওফীক দান করেন। অতঃপর এর বিনিময়ে অনেক বড় পুরস্কারে ভুষিত করেন। তোমাদেরকে ইবাদত-বন্দেগীর হুকুম করা হয়েছে; তোমরা তা পূরণ করেছ তোমাদেরকে সিয়াম সাধনার (রোযার) হুকুম করা হয়েছে; তোমরা তাও পূরণ করেছ-এভাবে তোমরা তাঁর আনুগত্য করেছ। সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের প্রাপ্য প্রতিদান ও পুরষ্কার নিয়ে যাও। অতঃপর ঈদের নামায শেষ হওয়ার পর ফেরেশতাগণ ঘোষণা করেন, আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে সফলকাম ও কৃতকার্য অবস্থায় বাড়ী ফিরে যাও। এভাবেই এ দিনটির নামকরণ হয়েছে 'পুরষ্কারের দিন'। উর্ধ্ব জগতেও এ দিনটিকে একই নামে অভিহিত করা হয়।' (তারগীব তারহীব ২/৩৮৮)

উম্মতে মুহাম্মদীর দীর্ঘ একমাসের সিয়াম সাধনা এবং ত্যাগের ফলাফল ঘোষিত হয় ঈদের দিন। যে দিন তার সকল কল্যাণ কামনা ও মুনাজাত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবুল করবেন। এ দিনটির তাৎপর্যকে কোনো মুসলমান অস্বীকার করতে পারে না তাই যুগ পরম্পরায় মুসলিম উম্মাহ্ মহা ধুমধামের সাথে ঈদ উৎসব পালন করে আসছে। আর তা হবেই না বা কেন? দীর্ঘ একমাস অবিরাম সিয়াম সাধনা ও নিবিড় প্রার্থনার কাঙ্খিত ফলাফল লাভের দিনটিতে সে যদি আনন্দ না করে তো

করবে কখন? তার সকল ইবাদত, রোনাজারি কবুলিয়্যাতের সার্থকতায় যে দিন ধ্বনিত হবে আরশে আযীমে সেদিন তার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হবে, মুখে ছড়িয়ে পড়বে খুশির আলোকচ্ছটা এটাইতো স্বাভাবিক। রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন– 'রোযাদারের আনন্দের সময় দু'টি– ইফতারের সময় ও ঈদের দিন।'

হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে ঈদের প্রথা ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন আনসারগণ তখনও বসন্ত ও হেমন্তের পূর্ণিমার রজনীতে 'মিহ্‌রিজান' এবং 'নওরোজ' নামে দু'টি পারসিক উৎসব নিয়মিতভাবেই পালন করে যাচ্ছে। নবীজী (ﷺ) তাদের বললেন, এই দু'টি দিন তোমারা উৎসব পালন কর কেন? তারা জবাব দিলো– জাহেলী যুগে আমরা এ দিন দু'টিতে আনন্দ-ফুর্তি করতাম তাই এখনও করি। নবী করীম (ﷺ) লক্ষ্য করলেন এ উৎসব দু'টিতে যে ধরনের আচার-অনুষ্ঠান হয়, তা মোটেও ইসলামসম্মত নয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আনসারদের উদ্দেশে ইরশাদ করলেন– তোমাদেরকে এই দিন দু'টির পরিবর্তে (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে) আরও উত্তম দু'টি দিন দান করা হয়েছে– এক. ঈদুল ফিত্‌র ও দুই. ঈদুল আযহা। অতএব, তোমরা পবিত্রতার সাথে শরীয়তসম্মত উপায়ে এ উৎসব দু'টি পালন কর।

ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব মূলত ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। ঘুরে ফিরে প্রতিবারই ভালোবাসা আর ত্যাগের সওগাত নিয়ে ঈদ আসে ঈদ চলে যায়। করির ভাষায় –

ঘুরে ফিরে বারে বারে
ঈদ আসে ঈদ চলে যায়–
ঈদ হাসতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়
ত্যাগের মহিমা শেখায়।

গোটা রমযান মাসটাই হলো সংযম আর ত্যাগের মাস। এ মাস ভোগের নয়, কৃচ্ছ সাধনার। সাহাবায়ে কেরাম এই মাসটিতে অন্যান্য মাসের তুলনায় কম খাওয়া-দাওয়া করতেন। তাই এ মাসে হাটে-বাজারে ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে আহার্য দ্রব্যের মূল্য সবচেয়ে কমে যেত। অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে খরচ কম হওয়ায় যে অর্থ বেঁচে যেত সাহাবায়ে কেরাম তা নিয়ে মসজিদে বসে থাকতেন অভাবগ্রস্তদের সন্ধানে। মোটকথা এ মাসে ভালো কাজ কে কতো করতে পারে, কে কতো সম্পদ ত্যাগ

করতে পারে, কৃচ্ছতা সাধন করতে পারে তা নিয়েই প্রতিযোগিতা চলতো।

ঈদের দিনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অন্য সাধারণ দিনের চেয়ে ভিন্ন এবং ভালো কিছু রান্না-বিশেষ করে মিষ্টি জাতীয় জিনিস এবং খাবার-দাবারের আয়োজন করা। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও সাহাবীগণ এই দিন কিছু টাটকা খেজুর এবং মিষ্টি হালুয়া খেতেন। তাই ঈদের দিনে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবার খাওয়া এবং খাওয়ানো রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নত; কিন্তু সুন্নত পালনের পরিবর্তে আমাদের ঈদতো পরিণত হয়েছে বিলাসের উৎসবে। পোলাও-কোর্মা, কোপ্তা-কালিয়া, রোস্ট-রেজালা, খিচুড়ি-বিরিয়ানি, জর্দা-ফিরনি, হরেক রকমের সেমাই আর হালুয়ার আয়োজন না হলে তো এদিন আমাদের উদরই পূর্তি হয় না। ত্যাগের উৎসব ঈদ আজ পরিণত হয়েছে ভোগের উৎসবে। সাহাবায়ে কেরাম নিজ স্বার্থ ত্যাগ এবং অভাবী নিরন্নকে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দকেই ঈদের আনন্দরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ ঈদের উৎসবে ত্যাগ নয়, ভোগ আর ভোজনই আমাদের মুখ্য আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাম্যের কবি নজরুল ইসলাম আক্ষেপ করে উম্মতে মুহাম্মদীর ক্ষয়িষ্ণু চেতনায় দংশনের উদ্দেশ্যে বলেছেন–

> জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
> মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
> একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
> উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু পাঁজরের হাড়?

অর্থাৎ, বিত্তবানরা মহানন্দে ঈদ উৎসব পালন করবে আর পার্থিব জীবনযুদ্ধে পরাজিত, রিক্ত হস্ত, নিঃস্ব, অসহায়রা এর কোনো অংশ পাবে না ইসলামী জীবন দর্শন এমনটি সমর্থন করে না; বরং সম্পদশালীদের মতো অসহায় গরীব-দুঃখীরাও ঈদ উৎসবের হিস্যাদার, ন্যায্য হিস্যাদার। পার্থিব ধন-সম্পদে তাদেরও প্রাপ্ত অংশ রয়েছে। আর তাই ঈদুল ফিতরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফিত্‌রা আদায় করা। ঈদের দিন সুবহে সাদেকের সময় যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ (হাওয়ায়েজে আছলিয়া) যথা–নিত্য ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, থাকার জন্য গৃহ এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে রায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমমূল্যের নগদ অর্থ বা অন্য কোনো মালের মালিক থাকবে, এই মাল তেজারত বা ব্যবসায়ের জন্য হোক বা না হোক, সে মালের উপর

বৎসর অতিক্রান্ত হোক বা না হোক-সেই ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের সাদকাতুল ফিতর বা বিশেষ সাদকা হলো প্রধান খাদ্য চাল, গম ও যবের আটা, খেজুর প্রভৃতির এক সা' বা তার মূল্য। তবে কেউ কেউ গমের অর্ধ সা'কেও সাদকাতুল ফিতর বলেছেন। এক সা' পরিমাণ সাধারণত ৩ সের ৯ ছটাক মতান্তরে ২ সের ১২ ছটাক। তবে মতভেদ যাই থাকুক না কেন, বিষয়টি যেহেতু দানের এবং মহা সওয়াবের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু অধিক পরিমাণে সাদকাতুল ফিতর আদায় করাটাই উত্তম। অর্থাৎ, **আমাদের দেশে গম বা আটার হিসাবে সাদকাতুল ফিতর দেয়ার যে রেওয়াজ চালু আছে তার পরিবর্তে যার যা প্রধান খাদ্য সেটির এক সা' বা তার সমমূল্যের অর্থ দান করাই অধিক সওয়াবের এবং যুক্তিযুক্তও বটে।** এ সাদকায়ে ফিতর ঈদের নামাযের পূর্বেই আদায় করা মুস্তাহাব। কোনো মালদার, মালদারের নাবালেগ সন্তানকে ফিতরা দেয়া জায়িয নয়। নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী বা নিজ ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী এদেরকেও ফিতরা দেয়া জায়িয নয়। অবশ্য এরা যদি সাদকাদাতা হতে পৃথক জীবন যাপন করে অর্থাৎ ভিন্ন পরিবারে বাস করে এবং নিতান্ত গরীব হয় তবে হাদিয়া-তোহফা বা সাধারণ দানস্বরূপ তাদেরকে পৃথকভাবে সাহায্য করতে হবে। তবে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক সাইয়্যেদ বংশের লোককে কোনো অবস্থাতেই ফিতরা দেয়া জায়িয নয়।

ঈদের দিনে সাহাবায়ে কেরাম নিজস্ব জামা-কাপড়ের মধ্য হতে সবচেয়ে সুন্দর জামাটি পরে ঈদগাহে নামায আদায়ের জন্য যেতেন। এ সুন্নাতের অনুসরণে আমরাও যার যার সাধ্যনুযায়ী নতুন ও সুন্দর জামা-কাপড় পরিধান করে থাকি; কিন্তু এ সুন্নাতের অনুসরণ করতে গিয়ে চরম বিকৃতি ঘটানোর কারণে সাহাবায়ে কেরামের সময় রোযার মাসে ঈদের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য যেক্ষেত্রে বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে সর্বনিম্নে থাকতো আমাদের সময় সেক্ষেত্রে ঈদের বাজার হয় আগুন। তাই সুন্নাতের অনুসরণের নাম করে আমরা যখন দামী (উচ্চ মূল্যের) পোষাক পরিধান করে ঈদগাহের দিকে রওনা হই তখন আমাদেরই প্রতিবেশী এক অভাবী বান্দা হয়তো ময়লা, ছেঁড়া, শত তালি দেয়া কাপড় নিয়ে ঈদের নামাযে শরীক হতে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। মূলত সারা রমযানে রোজা রেখে যে কৃচ্ছ্র সাধনা ও ত্যাগের অনুশীলন হয়, আমাদের ঈদের

অপচয়ের এবং এ দিনটিতে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে উঠার কারণে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন–'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে জেগে থেকে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে; সে ব্যক্তির দিল মরবে না, সেদিন অন্যান্য দিল মরবে।' (তাবরাণী)

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আতঙ্কে যখন অন্যান্য লোকদের দিল ঘাবড়িয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে; তখন দুই ঈদের রাত্র জাগরণকারীর দিল মোটেও আতঙ্কিত হবে না, ঘাবড়াবে না। নবীজী (ﷺ) আরও ইরশাদ করেন–'যে ব্যক্তি লাইলাতুল তারবিয়া (৮ই জিলহজ্জ), লাইলাতুল আরাফা (৯ই জিলহজ্জ), লাইলাতুন নহর (১০ই জিলহজ্জ), ঈদুল ফিতরের রাত এবং লাইলাতুল বরাআত-এই পাঁচ রাত্র জেগে থেকে ইবাদতে মশগুল থাকবে সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।' (মা ছাবাতা বিস্-সুন্নাহ্)

ঈদুল ফিতরের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমকে ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দরিদ্রের প্রতি সহনশীলতা, শৃংখলাবোধ, আত্মিক পরিতৃপ্তি, তাক্ওয়া প্রভৃতি অনুপম শিক্ষা দেয়া। অথচ ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ হতে আমরা দিনকে দিন দূরে, বহুদূরে সরে যাচ্ছি। আজকে আমরা মদীনার ইসলামের পরিবর্তে বাগদাদী, দামেস্কী, তুর্কী, বস্তুবাদী, ভোগবাদী, হালুয়া-রুটিসেবীদের ইসলাম নিয়ে মেতে আছি। যে কারণে ঈদুল ফিতর কারও জন্য নিয়ে আসে আনন্দের সওগাত আর কারও জন্য তা হয় নিরানন্দে ভরা নিরন্ন এক দিন। সুতরাং আমরা যদি একমাত্র তাজেদারে মদীনা, সারোয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর ইনসাফভিত্তিক ইসলামের প্রকৃত চর্চা করি তবে এর মাধ্যমেই আসতে পারে আমাদের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ আর ঈদ হয়ে উঠতে পারে আরও সার্থক ও অর্থবহ।

তাই আসুন, আমরা আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে হৃদয়ে ত্যাগের মশাল প্রজ্বলিত করি, ঈদুল ফিতরের প্রকৃত শিক্ষাকে বক্ষে ধারণ করি এবং তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেই; যাতে ঈদ সবার জীবনেই বয়ে আনে আনন্দ, খুশী ও উচ্ছলতার সওগাত আর প্রতিটি ঈদ উৎসবই যেন হয় ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রাহুগ্রাসে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর

তুষারাবৃত পর্বতমালায় ঘেরা হ্রদ-নদীময়, ফুল-ফলের অনিন্দ্য সুন্দর প্রাকৃতিক সুষমায় ভরা কাশ্মীর। তুষারের মুকুটপরা সুরম্য উপত্যকা ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। চতুর্দিক ১০-১৩ হাজার ফুট উঁচু পর্বতমালা পরিবেষ্টিত ৩৫০ মাইল দীর্ঘ আর ২৭৫ মাইল প্রস্থের উপত্যকাটিতে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস। যাদের প্রায় ৮০ শতাংশই মুসলমান, বাকিরা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান। কাশ্মীরের অধিবাসীরা অধিকাংশই নম্র, শান্তিপ্রিয় ও অতিথিপরায়ণ। তারা অন্যদের (ভিন্ন জাতি, দেশ) নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাদের নিয়ে অন্যদের মাথাব্যথার কমতি নেই। যে কারণে বহুবছর ধরেই কাশ্মীরের নাম থেমে থেমে সংবাদের প্রধান শিরোনামে উঠে এসেছে এবং এখনো উঠে আসছে। বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত তিন-তিনটি যুদ্ধের অন্তত দু'টির কারণই ছিলো কাশ্মীর।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পর থেকে কাশ্মীরের মানুষকে ভারতের মূল স্রোতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার যাবতীয় প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করে দিয়ে আজকের কাশ্মীর উত্তাল হয়েছে আজাদীর প্রশ্নে। বিভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন,

◆◆◆

তাবৎ দুনিয়ার দৃষ্টি যখন বলকান-আফগান মাটিতে মানুষের খুন দেখতে দেখতে ক্লান্ত তখন ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে আবারও স্বাধীনতাকামী মানুষের ক্রন্দনরোল অন্তত বিবেকবান মানুষকে মৃতপ্রায় করে তুলেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর শহীদী খুনে, আজাদীকামী মানুষের খুনে রাঙা হচ্ছে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে। এ ভূ-স্বর্গের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়েছিলো বহুকাল পূর্বেই; কিন্তু এ ভূ-স্বর্গকে তারা চূড়ান্তভাবে নরকে পরিণত করে ১৯৪৮ সাল থেকে। সেই থেকে আজ অবধি এর মাটি খুনে রাঙা হচ্ছে তো হচ্ছেই! কিন্তু কেন? এই কেন'র উত্তর খুঁজতেই এই লেখার অবতারণা।

◆◆◆

খণ্ডিত, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে প্রতিবাদ, কাশ্মীরী স্বজাত্যবোধ পুরোদস্তুর রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপ নিয়েছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সংকীর্ণতাবাদ, স্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দিশার অভাবকে ছাপিয়ে কাশ্মীরী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রাজনৈতিক মুনাফা লুটার চেষ্টায় রয়েছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলে, যারা কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা বা আজাদীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীল নয়; অন্যদিকে তেমনি কাশ্মীরে ঘটনাক্রমের অনভিপ্রেত বিকাশে সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী হীন থেকে হীনতর চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিস্থিতি মুকাবালার চেষ্টা করছে। নারকীয় সন্ত্রাস আড়াল করার জন্য তারা আওড়ে চলেছে রাজনৈতিক সমাধানের বুলি। এরূপ লাগামহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে কাশ্মীরী জনগণের অবস্থান হয়েছে স্পষ্ট থেকে আরো স্পষ্টতর। কাশ্মীরীদের আজাদী আন্দোলনের পরিচালনার ভার '৯০-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে ৪০টি দলের একটি জোটের হাতে থাকলেও বর্তমানে সন্দেহাতীত প্রভাবের অধিকারী মাত্র ৪টি মূল সংগঠন; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকশ্রেণীর একমুখো প্রচার ও ব্যাপক প্রপাগান্ডার কারণে কাশ্মীরের চলমান আন্দোলন নিয়ে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কোনো পরিষ্কার ছবি দানা বাঁধছে না। নতুন প্রজন্ম বিস্মৃত হচ্ছে কাশ্মীরী জনগণের ধারাবাহিক আত্মত্যাগের ইতিহাস। সুতরাং আজকের কাশ্মীরকে বুঝতে হলে যেমন প্রয়োজন কাশ্মীরের চলমান ঘটনার পরম্পরা অনুধাবন, তেমনি জানা দরকার কাশ্মীর সংকটের অতীত ইতিহাস।

কাশ্মীরে চলমান সংকটের সূচনা যেভাবে

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রনজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ইংরেজ-শিখ লড়াই বাধে যাতে শিখদের পরাজয় ঘটে এবং শিখ শাসন সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়। ইংরেজদের সাথে লড়াইয়ে শিখরা সম্পূর্ণ পরাজিত হবার পর দু'টি পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হয়। **এক.** লাহোর চুক্তি, **দুই.** অমৃতসর চুক্তি। প্রথমত, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ লাহোর চুক্তি অনুসারে শিখরা কাশ্মীরের কিছু কিছু ভূখণ্ড বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, অমৃতসর চুক্তি অনুসারে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর

লর্ড হার্ডিঞ্জ ৭৫ লাখ রুপীর বিনিময়ে জম্মু, কাশ্মীর ও হাজারা এলাকার উচ্চভূমি ডোগরা সর্দার পুলার সিং-এর কাছে বিক্রি করে দেয়। কাশ্মীর বিক্রির এই ঐতিহাসিক ঘটনা ইতিহাসের পক্ষে কখনও ভোলা সম্ভব নয়। স্মর্তব্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই চুক্তির আলাপ-আলোচনা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত নকশা প্রণয়নে যিনি মূল ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন লর্ড লরেন্স। অথচ পরবর্তীতে তিনিই এই চুক্তিকে ‘পাপদুষ্ট’ বলে আখ্যায়িত করেন। বৃটিশ সরকারের কৃপাধন্য ডোগরা রাজবংশ চারজন মহারাজার মাধ্যমে একশ’ বছর কাশ্মীর শাসন করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দালাল ডোগরা শাসকশ্রেণী এই একশ’ বছর কাশ্মীরী জনগণের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালনা করে। ফলে, খুবই সংগত কারণে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই ডোগরা শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাশ্মীরী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা প্রথমদিকে আলাপ-আলোচনার পথে প্রচেষ্টা চালায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান হলেও ডোগরা শাসনামলে ১৯৩০ সালে ৬৬ জন পদস্থ রাজকর্মচারীর মাঝে মাত্র ৬ জন ছিলেন কাশ্মীরী মুসলমান। ডোগরা শাসনামলের শেষদিকে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ৪ লক্ষ ডোগরা হিন্দুদের মাঝে সচ্ছল অবস্থা ছিলো যেক্ষেত্রে ১ লক্ষ, সেক্ষেত্রে ৪০ লক্ষ মুসলমানের মাঝে সচ্ছল ছিলো মাত্র ১ লক্ষ। আর ৬০ হাজার পাঞ্জাবীর মধ্যে অবস্থাপন্ন ছিলো ১ হাজার। তদুপরি ডোগরা রাজত্বে রাজধানী জম্মুতে স্থানান্তরকরণ কাশ্মীরীদের শুধু বৈষয়িকভাবে নয়, মানসিকভাবেও পীড়িত করেছিলো। ফলে, বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে রাজতন্ত্রবিরোধী আজাদী আন্দোলনও তিরিশের দশকের গোড়ায় এসে স্পষ্টরূপ নিয়েছিলো কাশ্মীরে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শুরু থেকেই রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠলো কাশ্মীরের আলোকপ্রাপ্তদের (অর্থাৎ, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তদের) নেতৃত্বে। ক্রমে তা গোটা কাশ্মীরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৩ই জুলাই বন্দীমুক্তির দাবিতে সোচ্চার জনতা সমবেত হয় কোতওয়ালির সম্মুখে। রাজতন্ত্রের সেবাদাস পুলিশের নিপীড়ন নেমে এলো জনতার উপর। উন্মত্ত জনতা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে ঢুকে পড়লো জেলে—মুক্ত করে আনলো রাজবন্দীসহ অন্যান্য বন্দীদের। অবশ্য ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে শাহাদতবরণ করেছে ১০৮টি তাজা প্রাণ। এই ঘটনা ছিলো কাশ্মীরীদের জাতীয় জীবনে প্রথম গণ-অভ্যুত্থান। তাই আজো ১৩ই জুলাই

কাশ্মীরে শহীদ দিবসরূপে পালিত হয়। কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রামের সেই শুরু, যা চলছে আজ অবধি। এই মুক্তি সংগ্রামও মাঝপথে স্বাধীনতাবিরোধীদের দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মূলস্রোত তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হলো। ধারা তিনটি হলো– মুসলিম সম্প্রদায়ভিত্তিক 'মুসলিম কনফারেন্স', হিন্দু সম্প্রদায়ভিত্তিক 'হিন্দু প্রজাপরিষদ' এবং সমাজবাদী চিন্ত া-চেতনায় বিশ্বাসীদের দল 'জাতীয় কনফারেন্স'। এই তিনধারা আর কখনো একস্রোতে এসে মিলিত হয়নি। একসময় মুসলিম কনফারেন্সে যোগ হলো মুসলিম লীগ। ফলে, মাঝপথে ঝিমিয়ে পড়া কাশ্মীর মুক্তির সংগ্রাম ১৯৪৬-এ এসে পুনরায় চাঙ্গা হতে থাকে। এ সময় জাতীয় কনফারেন্সের নেতৃত্বে কাশ্মীরে সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এটি শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং রাজার শাসনযন্ত্র উৎখাতের দাবীতে কাশ্মীরের সর্বত্র 'কাশ্মীর ছাড়ো' শ্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কৃষকদের খাজনা দেয়া বন্ধের আন্দোলনেও নতুন প্রাণ সঞ্চার হয় ; কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর আক্রমণ-নির্যাতনের মুখে 'জাতীয় কনফারেন্স' আত্মগোপনে বাধ্য হয় এবং এর নেতা শেখ আব্দুল্লাহ গ্রেফতার হন। সেই সাথে কাশ্মীর মুক্তির সংগ্রামও রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামে।

কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় কাশ্মীর প্রশ্ন উহ্য ছিলো। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন ঘোষিত হয় মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা। ভারত ত্যাগে বাধ্য হওয়ার মুখোমুখি এদেশে নিজেদের অধিকারটুকু টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেশভাগের ওপরই শেষ আশা ন্যস্ত করেছিলো। আর সেই সাথে রোপণ করেছিলো ভবিষ্যৎ রক্তের বীজ। মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা সেই উদ্দেশ্যেরই প্রতিচ্ছায়া। পরিকল্পনাটির ৫নং ধারা ছিলো– ডোমিনিয়ন দু'টির যে কোনো একটিতে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদানের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

পরিকল্পনার ঐ ৫ নং শর্ত অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলোর এই অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া তিনটি ব্যতিক্রম– জুনাগড়, হায়দারাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া অনেকটা নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হলো এবং ঐ দেশীয় রাজ্যগুলোতে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিলো। দেখা গেলো জুনাগড়ের বাসিন্দাদের অর্ধেকের বেশি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যের

মুসলিম শাসক পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। ভারত সরকার মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে জুনাগড়ে সৈন্য পাঠায়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে বিপুল ভোটাধিক্যে রাজ্যটির ভারতভুক্তি সমর্থিত হয় এবং নবাব পাকিস্তানে পলায়ন করেন। অথচ একই ধরণের সমস্যা যখন কাশ্মীরে দেখা দিলো তখন ভারত ঠিক তার বিপরীত অবস্থান নিলো। অর্থাৎ কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হওয়ায় রাজ্যটি পাকিস্তানের সাথে যোগদান করবে এটাই যখন সংখ্যাধিক্য মানুষের চাওয়া, তখন কাশ্মীরের শাসক বৃটিশের দালাল ডোগরা বংশীয় হরি সিং তার স্বভাবের বাইরে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ; কিন্তু তার এ সিদ্ধান্তের হেতু বুঝতে কাশ্মীরী জনগণের সময় লাগেনি। জম্মু-কাশ্মীরে এই সময় জাতীয় কনফারেন্সের নেতৃত্বে মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধরা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক কাশ্মীর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। তারা সামন্ত প্রভুদের শাসন মেনে নেবে না বলে ঘোষণা দেয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কাশ্মীর পরিদর্শনের সময় মাউন্ট ব্যাটন সেখানকার রাজাকে গণভোট অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এই রাজ্যের জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান বিধায় এটি পাকিস্তানভুক্ত হবে ; কিন্তু সেখানেও অনীহা দেখে শেষ পর্যন্ত জুনাগড়ে ভারত অনুসৃত পথে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতিরা 'আজাদ কাশ্মীর' নামে মুসলিম কাশ্মীর সৃষ্টির লক্ষ্যে কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং ২৬শে অক্টোবরের মধ্যে তারা শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পৌঁছায়। এমতাবস্থায় রাজপ্রশাসন ভেঙে পড়লে রাজা হরি সিং শ্রীনগর থেকে পলায়ন করেন এবং ভারত সরকারের সাহায্য চান। উক্ত পরিস্থিতিতে জাতীয় কনফারেন্সের গণতান্ত্রিক অংশ ও কমিউনিস্টদের সংগঠিত জনশক্তি শহর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মাউন্ট ব্যাটনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২৭শে অক্টোবর ভারতীয় ছত্রীবাহিনীকে শ্রীনগরে পাঠানো হয় এবং পরদিনই পাঠান উপজাতিদের অনুগামী নিয়মিত পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধে। এভাবে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এদিকে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর অধিকৃত কাশ্মীরে '*আজাদ কাশ্মীর*' নামে গঠিত হয় একটি বিপ্লবী সরকার। এভাবে অক্টোবরের শেষ থেকে '৪৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুদ্ধ চলার পর

ভারতীয় সৈন্য উরি, বন্দীপুর ও বুন্দী সীমারেখায় পৌঁছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হলো দ্বিধাবিভক্ত; জম্মুর অংশ মীরপুর, মুজাঃফরাবাদ, পুঞ্চ, গিলগিট ও কারগিল অঞ্চল গেলো সীমানার ওপারে। এপারে জম্মুর বাকী অংশ, লাদাঘ ও কাশ্মীর উপত্যকা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী সেই বরাবর নির্দিষ্ট হলো যুদ্ধবিরতি সীমা। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের পর নতুন নামকরণ হলো প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা। এরই মধ্যে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত, পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তিনটি যুদ্ধ। কাশ্মীর হয়েছে তিন খণ্ডে বিভক্ত। ভারত অধিকৃত কাশ্মীর, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ও চীন অধিকৃত কাশ্মীর। ভারতের অধিকারে রয়েছে কাশ্মীরের ১,১৩,০০০ বর্গ কি.মি., পাকিস্তানের অধিকারে রয়েছে ৭৮,৯৩২ বর্গ কি.মি. আর চীনের অধিকারে রয়েছে মোট ৪২,৭০০ বর্গ কি.মি. আয়তনের ভূখণ্ড।

কাশ্মীর বিষয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের দাবী জানায়। পাক-ভারত উভয় পক্ষের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পক্ষের মতামত যাচাই করার পর নিযুক্ত হয় পাঁচ সদস্যের 'ভারত ও পাকিস্তান সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিশন'। কাশ্মীর সংকট সমাধানে জাতিসংঘ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়।

কমিশনের প্রথম প্রস্তাব উদ্ভূত অঞ্চল থেকে উভয়পক্ষের সেনা অপসারণ– এ প্রস্তাব পালিত হয়নি। '৪৮-এর আগষ্টে কমিশন একটি ত্রিমুখী প্রস্তাব হাজির করে। প্রথমত: যুদ্ধবিরতি, দ্বিতীয়ত: সেনা অপসারণ, তৃতীয়ত: গণভোট। বিবাদ বাধে দ্বিতীয় প্রস্তাবে; ভারতের দাবী, এই প্রস্তাব অনুযায়ী আজাদ কাশ্মীর বাহিনীকে অপসারণ করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান তা মানতে নারাজ (জুনাগড়, হায়দারাবাদসহ একাধিক প্রশ্নে ভারতের অবস্থান পাকিস্তানের অজানা নয়)। ফলে, জাতিসংঘ পড়ে বেকায়দায়। '৪৯-এর ডিসেম্বরে তৃতীয় প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ নিয়োগ করে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান বিচারপতি ওয়েন ডিক্সনকে, সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। সরেজমিন তদন্তের পর ডিক্সন রিপোর্ট পেশ করেন '৫০-এর সেপ্টেম্বর মাসে। মীমাংসা প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় পক্ষকে দায়ী করে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের প্রকাশিত ইচ্ছার ভিত্তিতে জম্মু ও লাদাঘ অঞ্চলকে

বিভাজনের প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ লাদাঘ যাবে ভারতে। কারগিল পাকিস্ত ানে। কাশ্মীর দেশভুক্তির প্রশ্ন স্থানীয় গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা হবে ; কিন্তু ভারত গণভোটের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

'৫১ সালে নতুন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এলেন গ্রাহাম। সবচেয়ে বিতর্কিত সৈন্য অপসারণের বিষয়টি সমাধানের জন্য এক প্রস্তাব হাজির করলেন তিনি। ভারতীয় তরফে মোট ১৩,০০০ আর পাকিস্তান তরফে মোট ১০,১০০ সৈন্য থাকুক। বাকীরা অপসারিত হোক। এ প্রস্তাব নাকচ করে ভারতের পক্ষ থেকে পাল্টা প্রস্তাব দেয়া হয় ভারতীয় তরফে ২১,০০০ ও পাকিস্তানের তরফে ৪,০০০ সৈন্য থাকার। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রস্তাব ছিলো যুদ্ধ বিরতির সময় উভয় পক্ষের সেনা সংখ্যার যে কোন আনুপাতিক সেনা প্রহরা। এসব প্রস্তাবের কোনোটিই গৃহীত হয়নি। জাতিসংঘের পরবর্তী নির্দিষ্ট প্রস্তাবও বাতিল হয়। শেষ পর্যন্ত '৫৭ সালে ভারত কাশ্মীর প্রশ্নে জাতিসংঘের মধ্যস্থতা মানতে অস্বীকার করে। '৪৮ থেকে '৫৭ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কম করে হলেও পাঁচ পাঁচবার গণভোটের প্রস্তাব দিয়েছিলো। যার কোনোটিতেই ভারত কর্ণপাত করেনি। অতঃপর ১৯৭২ সালে ইন্দিরা ও ভুট্টোর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় 'সিমলা চুক্তি'। যার মূল বক্তব্য ছিলো– ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা দ্বিপাক্ষিকভাবেই সমাধান করতে হবে। তৃতীয় কোনো ফোরামে তা তোলা বা উত্থাপন করা যাবে না কিন্তু সিমলা চুক্তির পর কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের অবস্থান পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ় হয়।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ ছাড়াও এ সময় কমনওয়েলথ ও বিভিন্ন দেশের নিজস্ব উদ্যোগে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ ৪৮ বছর যাবত কাশ্মীর সমস্যা অমীমাংসিত থাকার জন্য শুধু জাতিসংঘের প্রস্ত াব বাস্তবায়নে ভারতের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গই দায়ী নয়, তৎকালীন পরাশক্তি ভারতের প্রধান মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাও কম-বেশী দায়ী। কারণ, ১৯৪৭, ১৯৫২, এবং ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নটি আলোচনাকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিনিধি একতরফা ভারতের ভূমিকা সমর্থন করেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নে আলোচনা করতে চাইলে সোভিয়েত প্রতিনিধি আন্দ্রে গ্রোমিকো জোরালো কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কাশ্মীর হচ্ছে ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা কাশ্মীরের জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।' এমন

নির্জলা মিথ্যা এমন একটি স্থানে বিশ্বের বুকে আর কেউ কখনো বলেছিলো কিনা তা ইতিহাস অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রাহুগ্রাসে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর

১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্স বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলো। তার নেতৃত্বাধীন কাশ্মীরী সরকার সিদ্ধান্ত নেয় নতুন সংবিধান রচনার। কিন্তু এতে বাধ সাধলো ভারতের কেন্দ্রীয় নেহরু সরকার। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও নেহরু শেখ আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো। চূড়ান্ত সূচনা সে সময় থেকেই। পরবর্তীতে অবশ্য শেখ আব্দুল্লাহর পুত্র ফারুক আব্দুলল্লাহ পিতার পথকে অনুসরণ করে কাশ্মীরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী তাকে বশংবদ বানাতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হটিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে। ইন্দিরার মৃত্যুরপর অবশ্য তার পুত্র রাজীব গান্ধী ফারুক আব্দুল্লাহকে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দিলে তিনিও সানন্দে তাতে রাজি হয়ে যান। মূলত দিল্লীর শাসকরা আব্দুল্লাহ পরিবারকে তাদের প্রয়োজনেই ব্যবহার করেছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই কেড়ে নেয়া হয়েছে ক্ষমতা, ছুড়ে ফেলা হয়েছে আঁস্তাকুড়ে। যে কারণে আব্দুল্লাহ পরিবার দীর্ঘদিন কাশ্মীরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। আর জনগণও তাদেরকে আজ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ঠিকই টের পেয়েছে। তাই নব উদ্যমে শুরু করেছে আজাদী আন্দোলন।

আজাদীর প্রশ্নে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হয়ে আজ যখনই জাতিসংঘের পেশকৃত গণভোটের প্রস্তাবের পক্ষে বিক্ষোভ হয়, তখনই গণতন্ত্রের মুখোশপরা হিংস্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় সরকার তার পোষা মানুষরূপী পশু-সেনাদের লেলিয়ে দেয় কাশ্মীরী মুসলিম জনতার উপর। ভারতীয় সৈন্যরা শৃংখলহীন পাগলা কুকুরের ন্যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরো নির্মম ধরনের নিপীড়ন কৌশল প্রয়োগ করার জন্য ইতোপূর্বেই যেসব ইহুদী সারমেয়দের ডেকে আনা হয়েছিলো তারাও মুসলিম জনতার উত্থানকে

নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য পাইকারী হারে নির্যাতন শুরু করে। শহীদী খুনে রাঙা হয় কাশ্মীরের শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম আর রাজপথ। অগণিত মানুষের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে প্রকম্পিত রাজপথ। শকুনীর তীব্র নখরাঘাতে, বুলেটের আঘাতে নিথর পড়ে থাকা শত-সহস্র আজাদীকামী মানুষ, অজস্র আহতের চিৎকার, স্বজনহারা মজলুমের আহাজারি সত্ত্বেও কাশ্মীরের জনগণ এগিয়ে চলছে আজাদীর স্বপ্নে। বুলেট আর নিপীড়নের মুখেও থেমে নেই কাশ্মীরী জনতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, বরং তা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কাশ্মীরের ঘরে ঘরে আজ প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা। একাজে থেমে নেই মুসলিম মহিলারাও।

কাশ্মীরে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার কাশ্মীরীর খুনে রাঙা হয়েছে মাটি। আহত হয়েছে অসংখ্য। সম্ভ্রম হারিয়েছে হাজারো মুসলিম মা-বোন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানবাধিকার সংগঠন কাশ্মীরে ভারতের বর্বর-পাশবিক আচরণের নিন্দা করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী সরকারগুলোর পোড়ামাটি নীতির কারণে কাশ্মীর বহুপূর্বেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাশ্মীরে ভারতীয় পতাকা পোড়ানো এখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ভারতের প্রতি যে কাশ্মীরীদের কোনো সমর্থন নেই তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ভারতীয় সমর বিশারদ ভবানী সেনগুপ্তের একটি উক্তি থেকে। তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিলো কতজন কাশ্মীরী ভারতের সাথে (পক্ষে) রয়েছে? তিনি তখন বলেছিলেন– 'Only one Dr. Farook Abdullah but that does not mean we will give up Kashmir.' সুতরাং, কাশ্মীরী মুক্তিকামী জনতার সম্মুখে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোনো পথ খোলা রইলো না।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের সংকট উত্তরণে স্বাধীনতাই একমাত্র সমাধান

বিভিন্ন সময়ে কাশ্মীর সংকটের সমাধানকল্পে ভারত- পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বৈঠকগুলো সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে একসময়কার জম্মু-কাশ্মীর মুক্তিফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাজা মুজাফফর আহমদ বলেন– 'কাশ্মীরীদের অংশগ্রহণ ব্যতীত কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে আলোচনাই হোক না কেন, তা হবে

অর্থহীন। কাশ্মীর সংকট কোনো ভূখণ্ডগত বিরোধের ফল নয়। কাশ্মীরী জাতি কাশ্মীর সমস্যার একটি মৌলিক পক্ষ। তাদের বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বের বিরোধী নই; কিন্তু কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা ও শাহাদাতের বিনিময়ে তা হওয়া অনুচিত।'

অর্থাৎ, কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কাশ্মীরীদেরকেই দেয়া হোক। সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের দাবীও অবশ্য তাই। কারণ দু'টি দেশের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে একটি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক–কোনো বিবেকবান মানুষই তা কামনা করেনা। অবশ্য ভারত বলে বেড়াচ্ছে, সিমলা চুক্তির আওতায় কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে সে পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। কিন্তু বিশ্ববাসীকে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, সিমলা চুক্তিতে কি লেখা আছে না আছে তা একান্তই ভারত-পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপার, এতে কাশ্মীরীদের ভাগ্যকে সংশ্লিষ্ট করা কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না। কারণ, ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিই কাশ্মীর সম্পর্কে শেষ কথা নয়। আর কাশ্মীরীরাও কোনো চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে বিক্রির অধিকার পাকিস্তানের কিংবা ভারতের কাউকে দেয়নি।

কাশ্মীরী জনগণের মুক্তিসংগ্রাম আজ তাবৎ দুনিয়ার বিবেক আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করার পরও ইউরোপসহ গোটা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক মহলকে পর্যন্ত আজ বলতে হচ্ছে– 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হলে সেখানে স্বায়ত্ত্বশাসন দেয়া দরকার। আর এজন্য ভারত-পাকিস্তান ও কাশ্মীরী নেতৃবর্গের সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে।'

সুতরাং, কোনো প্রকার শঠতা এবং চালাকি দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না। কাশ্মীরীদের দুঃখে চোখের পানি ফেলার আগে এ প্রশ্নের জবাব চাই যে, জুনাগড়ের ভাগ্য যদি জুনাগড়ের জনগণ স্থির করতে পারে তবে কাশ্মীরের ভাগ্য ভারত কিংবা পাকিস্তান স্থির করবে কেন? জবাব চাই এ প্রশ্নেরও যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কাশ্মীর কেন সত্য

সত্যই স্বাধীনতা পেতে পারে না– কেন ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে তার ভাগ্যকে যুক্ত করতেই হবে?

খুনরাঙা কাশ্মীরের স্বাধীনতা : সমাধান কোন পথে?

আজ আর ভিন্ন ভিন্ন অংশের আজাদী (স্বাধীনতা) নয় বরং বৃহৎ কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে। পাকিস্তান-ভারত-চীন নয়, চাই ঐক্যবদ্ধ কাশ্মীর। কাশ্মীরী মুসলমানদের শহীদী খুনের বন্যা আজ এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে যে, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন কাশ্মীর আর কোনো দেশের অধিকৃত অংশ থাকবে না। কাশ্মীর কারো দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

আল্লাহ্‌র কসম! ইতিহাস সাক্ষী, কাশ্মীরী জনতা অর্ধশতাব্দী কাল ধরে আলোচনার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করে আসছিলো। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতিসংঘের প্রস্তাব– অর্থাৎ, জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী গণভোটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীর সংকটের একটি স্থায়ী ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা। আর কাশ্মীরী জনতা এ আশায় বুক বেঁধে প্রহর গুনছিলো ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি যখন সেই পথ প্রত্যাখ্যান করে জেল-জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে কাশ্মীরী জনগণের প্রাণ স্পন্দনে মিশে থাকা আজাদীর (স্বাধীনতার) আকাঙ্ক্ষাকে পিষে মারার পথে হাঁটছে তখন দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে শৃংখলমুক্ত করতে, বাস্তবে রূপ দিতে জান-মাল দ্বারা সর্বোচ্চ সংগ্রামের বিকল্প কোনো পথতো নজরে পড়ছে না। সুতরাং, আল্লাহ্‌পাকের দরবারে সবিনয়ে এই প্রার্থণাই করি– তিনি যেন কাশ্মীরী মজলুম মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র রাহে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করেন এবং ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রাহুগ্রাস হতে মুক্তি দিয়ে তাতে আবার ফিরিয়ে দেন জান্নাতী আবহ। আমীন ॥

[এ প্রবন্ধটির সহযোগী লেখক : মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী]

আমেরিকা শয়তান খুঁজছে,
আসলে শয়তান কে?

সময়টা ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১। ইহুদী চক্রের সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় এক ভয়াবহ ঘৃণ্য নাটক সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়ে গেল। পরিণতিতে ধ্বংস হলো টুইন টাওয়ার। বোমা পড়লো বিশ্বের সবচেয়ে ঝানু করিৎকর্মা গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তর পেন্টাগনে। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের উপর প্রবল ঘৃণা বর্ষণ আরম্ভ হলো। কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিবেকবান এবং চিন্তাশীল মানুষের অন্তরে প্রশ্ন জাগলো– এই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে বা দিচ্ছে কারা? কারাই বা মানুষকে স্বাভাবিক জীবন থেকে সন্ত্রাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

◆◆◆

মিস্টার জর্জ বুশ জুনিয়র বলেছেন, মার্কিন সরকার শয়তান খুঁজছে, যারা বিশ্বকে নরকে পরিণত করতে চাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো– আসলে শয়তান কারা ? একটু কষ্ট স্বীকার করে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেই মার্কিন সরকার অতি সহজেই তা বুঝতে পারবে। কারণ, সন্ত্রাসীদের চেয়েও বড় শয়তানতো তারা যারা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

◆◆◆

একটু জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই এর উৎস বের হয়ে আসবে। যেমন, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকার বুশ প্রশাসন বিশ্ব মানবতার কথা বারবার উচ্চারণ করেছে অথচ মার্কিন সরকারকে যদি প্রশ্ন করা হয়– আপনাদেরই প্ররোচনায় আপনাদেরই যোগানকৃত অর্থ-অস্ত্র ব্যবহার করে কুয়েত দখলের অপরাধে অর্থনৈতিক অবরোধের নামে ইতোপূর্বে ইরাকের যে হাল করলেন, খাদ্য, ওষুধের অভাব আর পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তায় রোগে-শোকে লক্ষ লক্ষ শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো– এর নাম কি মানবতাবোধ? টুইন টাওয়ারে

হামলার তথাকথিত পরিকল্পনাকারী উসামা বিন লাদেনকে ধরার নামে আফগানিস্তানে যে গণহত্যা চালালেন– তার নাম কি মানবতা?

টুইন টাওয়ারে হামলার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রকার তথ্য-প্রমাণ বিশ্ব-বাসীর সম্মুখে উপস্থাপনের পরিবর্তে কয়েকটি পাসপোর্ট এবং ছবি প্রদর্শন করেই মার্কিন প্রশাসন বলে দিলো পাসপোর্টধারী ঐ ব্যক্তিরাই টুইন টাওয়ার আর পেন্টাগনে হামলা চালিয়েছে এবং ধর্মীয় পরিচয়ে তারা মুসলমান। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ঐ পাসপোর্টগুলো উদ্ধার (!) করা হয়েছিলো টুইন টাওয়ারের ধ্বংশস্তুপ থেকে। বুশ প্রশাসনে কারামত দেখানোর লোক আছে এ কথাতো তাহলে বিশ্বাস করতেই হয়। কেননা হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় যেখানে টুইন টাওয়ারের মূল ইস্পাত কাঠামো পর্যন্ত গলে গিয়েছিল সেখানে মার্কিন গোয়ান্দাদের কারামতের কারণে শুধুমাত্র অভিযুক্ত ঐসকল তথাকথিত হামলাকারীদের পাসপোর্টগুলো অক্ষত রয়ে গেল। কিন্তু পাসপোর্ট উদ্ধারের মাধ্যমে হামলাকারী চিহ্নিত করা গেলেও মার্কিনী ভাষ্য মতে তারা সবাই যেহেতু হামলায় ব্যবহৃত বিমানের মাঝেই মৃত্যুবরণ করেছে সেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উক্ত হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এরূপ কোন একজন জীবিত মুসলমানের খোঁজে তারা আদাজল খেয়ে লেগে গেল। এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকা কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বকে শোষণের প্রতিবাদের প্রতীক উসামা বিন লাদেনকে টুইন টাওয়ারে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী সন্ত্রাসী হিসেবে আবিস্কারের মাধ্যমে বুশ প্রশাসন তাদের নতুন মিশন বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরলো। অতঃপর আফগান সরকারের নিকট তাদের দেশে অবস্থানকারী উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার নিকট হস্তান্তর করতে বলা হলো। আফগানিস্তানের ইসলামী সরকার বললো- উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের নিকট উপস্থাপন করুন; পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি আপনাদের অভিযোগ সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমরা আমাদের মেহমান দ্বীনি ভাই উসামা বিন লাদেনকে আপনাদের কাছে নয় আন্তর্জাতিক আদালতে হস্তান্তরের চিন্তা-ভাবনা করবো। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তানের আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের নিকট কোন প্রমাণপত্র উপস্থাপনের পরিবর্তে অভিযোগের কাগজ-পত্র পেশ করলেন বৃটেনের টনি ব্লেয়ার সরকারের নিকট। কী বিচিত্র এদের সভ্যতা! কী বিচিত্র এদের অপকৌশল। অভিযোগ

করলেন কার নিকট, আর প্রমাণ পেশ করলেন কার নিকট! অতঃপর বুশ প্রশাসনের প্রকাশ্য মদদে ইঙ্গ-মার্কিন জোট উসামা বিন লাদেনকে ধরার নামে আফগানিস্তানে যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করলো পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এক বিন লাদেনকে ধরার অজুহাতে সর্বশেষ প্রযুক্তির সকল ধরনের বোমার কার্যকারীতা পরীক্ষা করার জন্য যেভাবে আফগানিস্তানের মাটি ও মানুষকে তারা ব্যবহার করলো সেটা কোন ধরনের মানবতা? বিনা প্রমাণে অভিযুক্ত একজন ভিনদেশীকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে একটি স্বাধীন দেশের পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নেয়াটা কোন ধরনের সভ্যতা? এরই মাঝে (অক্টোবর, ২০০১) আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ নির্দেশ দিয়েছেন উসামা বিন লাদেনকে যে কোন মূল্যে হত্যার। এজন্য তিনি ইতোমধ্যেই সিআইএ (CIA) কে বাড়তি ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়ে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। হায়! দুনিয়ার বুক থেকে কি ন্যায় বিচার, আইন-আদালত সব উঠে গেলো। নচেৎ কিভাবে একটি আধুনিক সভ্য দেশের প্রেসিডেন্ট অপর দেশের একজন নাগরিককে বিনা বিচারে হত্যার নির্দেশ দেন!

সম্প্রতি আবারও মানবতা আর বিশ্বশান্তির ধুয়া তুলে মানব বিধ্বংসী কাল্পনিক মারণাস্ত্র উদ্ধার ও তা ধ্বংসের নামে ইরাকে হামলা চালানো হলো। মার্কিন হায়েনাদের বিষাক্ত নখরাঘাতে বাগদাদের শত-সহস্র বৎসরের মানব সভ্যতার প্রাচীন নির্দশনাদি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। সাহাবায়ে কেরাম আর অলি-আল্লাহ্গণ জান্নাতী আবহ তেরী করে চির-নিদ্রায় শায়িত আছেন যে পবিত্র ভূমিতে, শত শত টন বোমার আঘাতে সেখানকার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হলো বারুদের গন্ধ আর স্বজন হারানো মজলুমের চাপা আর্তনাদ। বুলেটের আঘাতে নিভিয়ে দেয়া হলো কত-শত তরুন-তাজা বাগদাদীর স্বপ্ন প্রদীপ। মার্কিনীদের নিক্ষিপ্ত মানবতাবাদী (!) বোমায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিলো। গৃহহীন হলো। অথচ আজ অবধি রাসায়নিক বা জীবাণু অস্ত্র পাওয়াতো দূরের কথা এসব অস্ত্র তৈরীর এক তোলা কাঁচামাল পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি কায্যাবের দল।

আজ একদিকে ইহুদীবাদ কায়েম রাখার জন্য বুশ প্রশাসন কর্তৃক ইসরাইলকে তোষণ করার নীতি গৃহীত হয়েছে অপরদিকে শান্তি আলোচনার

মুলো ঝুলিয়ে ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্রহীন করার পাঁয়তারা চলছে। ফিলিস্তিনের ছোট শিশুরা যখন হানাদার ইসরাঈলী সৈন্যদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই শিশুদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে অথচ লেবাননে নারী ও শিশুদের বসবাসের তাবুর ওপর যখন ইসরাঈলীরা গুলি-বোমা বর্ষন করে তখন তাদের ব্যাপারে টু-শব্দটিও উচ্চারণ করা হয় না। মুসলমান ও ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড (দ্বি-মুখী) নীতি ইতিহাসের পাতায় বহুদিন ধরেই লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

একবার ভাবুন তো, কোটি কোটি দুর্বল নর-নারী ও নিষ্পাপ শিশুর তাজা খুনের ছিটায় যাদের সর্বাঙ্গ রঙিন; মজলুমের বুক যাদের বুলেট-মিসাইলের লক্ষ্যস্থল; বলপূর্বক বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অগণিত মানুষের স্বাধিকার হরণপূর্বক তাদেরকে যারা গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছে; যাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্পাপ শিশু, অচল বৃদ্ধা, অসহায় নারী এমনকি শয্যাশায়ী রোগী পর্যন্ত নিষ্কৃতি পায় না; সামান্য খোঁড়া অজুহাতে যখন-তখন বিমান হামলা চালিয়ে দোষী-নির্দোষ নির্বিচারে সকলকে পশুর ন্যায় হত্যা করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না; দূর অতীতে যারা স্পেনের বুকে খৃষ্টীয় নবম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোলাগুলি, হত্যা, লুটতরাজসহ নানাবিধ জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে; শত শত মুসলমানকে জ্বালিয়ে ভস্মীভুত করে দিয়েছে; শত শত লোককে বন্দী করে তাদের সম্মুখে তাদেরই শিশু বাচ্চাদেরকে যবাই করেছে; আর নিকট অতীতে যারা বসনিয়া হার্জেগোভিনায় লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে পৈশাচিকভাবে সম্ভ্রমহারা করেছে, হাজার হাজার শিশুকে জবাই করে, পুড়িয়ে মেরেছে, যাদের অত্যাচারে উভয় সময়েই আপন দ্বীনের হেফাজতের খাতিরে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে–সেই মানবতার শত্রুরাই কি-না আজকে জিহাদকে সন্ত্রাস বলছে! আর তাদের সাথে দ্বি-মত পোষণকারী মুক্তিকামী মজলুম প্রতিবাদী মুসলমানদেরকে বলছে সন্ত্রাসী!

মূলত ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়েই মার্কিনীদের অন্তঃসারশূণ্যতা বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছিল। যা আবারও প্রমাণিত হয়েছে সিআইএ, এফবিআই-এর মতো ঝানু করিৎকর্মা গোয়েন্দা

সংস্থা থাকার পরও টুইন টাওয়ার আর পেন্টাগনে যাত্রীবাহী বিমান হামলার মধ্য দিয়ে। সুতরাং দাদাগিরির সময় ফুরিয়ে এলো বলে!

শেষ করার আগে তাই বলতেই হচ্ছে– মিস্টার জর্জ বুশ জুনিয়র বলেছেন, 'মার্কিন সরকার শয়তান খুঁজছে, যারা বিশ্বকে নরকে পরিণত করতে চাচ্ছে।' কিন্তু প্রশ্ন হলো– আসলে শয়তান কারা? একটু কষ্ট স্বীকার করে আয়নায় নিজেদের চেহারাটা দেখলেই মিস্টার বুশ অতি সহজেই তা বুঝতে পারবেন। কারণ, সন্ত্রাসীদের চেয়েও বড় শয়তানতো তারা যারা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

'কারো মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (সত্য-মিথ্যার যাচাই ব্যতীত) তাই (অপরের নিকট) বর্ণনা করে।'
[সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ]

জিহাদ ও প্রচলিত যুদ্ধঃ
কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইতিহাস কী বলে?

আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের, যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল, বিচার দিনের মালিক। অগণিত দরূদ ও সালাম আল্লাহ্র হাবীব সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবার-পরিজন, সহচর ও অনুসারীগণের প্রতি। আমরা আবারও আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করছি এবং অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকা ও অনিষ্ট থেকে তাঁরই নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর যা বলতে চাই–কালামে পাকে মহান আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟

بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

'ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। মূলত তারাই সত্যনিষ্ঠ্য।' (সূরা আল হুজুরাত ১৫)

উল্লিখিত আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য বান্দাকে তিনটি স্তর অতিক্রম করার শর্ত দিয়েছেন। এক. আল্লাহ্কে রব এবং মুহাম্মদ (ﷺ)কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া। দুই. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনীত ঈমান সন্দেহমুক্ত হওয়া। তিন. স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামর্থ অনুযায়ী নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে (আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায়) জিহাদ করা। অর্থাৎ, এসবের কোন একটির অনুপস্থিতি বান্দার পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। সুতরাং কেউ যদি বলে, আমিতো আল্লাহ্কে রব এবং মুহাম্মদ (ﷺ)কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি, এবং তাতে কোনরূপ সন্দেহকে স্থান দেইনি; আমি কি তবে ঈমানদার নই? আমার ঈমান কি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়? বান্দার এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ পাক বলছেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٢﴾

'তোমরা কি ভেবেছ তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ্ এখনো পরীক্ষা করে দেখেননি, তোমাদের মাঝে কে এমন আছে, যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল।' (সূরা আল ইমরান ১৪২)

অর্থাৎ, ঈমানদার হওয়ার দাবীদার বান্দাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পরও যে বান্দা কোনদিন জিহাদ করলো না, এমনকি জিহাদকে ধর্মের নামে অহেতুক রক্তপাত মনে করে অন্তরে জিহাদের তামান্না পর্যন্ত পোষণ করলো না, সে বান্দার সম্পর্কে হাদীসে রাসূলে ইরশাদ হয়েছে :

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, সে না জিহাদ করেছে আর না তার মনে জিহাদের তামান্না উদয় হয়েছে; তো সে এক প্রকার নিফাকের (অর্থাৎ মুনাফিকীর একটি শাখার) উপর মৃত্যুবরণ করলো।' (হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুসলিম)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

'যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় না কখনো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে, না কোন মুজাহিদকে যুদ্ধের উপকরণ দ্বারা সাহায্য-সহযোগীতা করেছে, আর না কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের খোঁজ-খবর নিয়েছে; তো আল্লাহ্ কিয়ামত আসার পূর্বেই তাকে এক ভীষণ আযাবে নিপতিত করবেন।' (হযরত আবূ উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবূ দাঊদ)

কিন্তু হায়! আফসোস! উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য শুধুই আফসোস! কারণ, বিশ্বের তাবৎ ইয়াহুদী, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী তথা ইসলামের দুশমনদের জিহাদবিরোধী রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা, পাশ্চাত্য মিডিয়ার লাগামহীন অপপ্রচার, অমুসলিম কলমবাজ ঐতিহাসিকগণের সত্য গোপন করা বানোয়াট ও বিকৃত ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাস, মুসলমানের ছদ্মবেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও তদীয় ভাড়াটে বুদ্ধিবাজ বুদ্ধিজীবী আর দুনিয়াপ্রেমী কতিপয় মাওলানা উপাধীধারী মোল্লা-মৌলভীর বিভ্রান্তিকর জিহাদবিরোধী প্রচারণার তোপের মুখে জিহাদের ন্যায় এক মহান ইবাদাতের দায়িত্ব ছেড়ে

দিয়ে দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হওয়ার এবং শহীদী মৃত্যু তালাশের পরির্বতে প্রাণের ভয়ে শৃগালের ন্যায় গর্তে আত্মগোপন করে থাকার মানসিকতা মুসলিম জাতির মাঝে আজ ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে।

আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ সত্যিই বড় মহান, প্রজ্ঞাময়। তাঁর অশেষ দয়া ও রহমত তাঁরই প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)-এর উম্মতের প্রতি; যাদেরকে তিনি জিহাদের ন্যায় একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আমলের সন্ধান দিয়েছেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য জিহাদকে জান্নাতের পথ এবং মুক্তির উসীলা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মানব জাতির পথ নির্দেশ স্বরূপ আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআন নাযিল করেছেন। এই কুরআনুল কারীমে জিহাদ শব্দটি ২৬ বার এবং ক্বিতাল শব্দটি ৭৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও আল কুরআনের কোথাও পূর্ণ সূরায় আবার কোথাওবা সূরার অংশ বিশেষে জিহাদ সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট ও সাবলীল আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, সূরা আল আন্ফাল (যার অপর নাম সূরা বদর) ও সূরা বরাআ'তে (সূরা আত্ তাওবা) শুধুমাত্র জিহাদ সম্পর্কিত আলোচনাই স্থান পেয়েছে। আবার সূরা আল বাক্বারা, সূরা আল মায়েদাহ্, সূরা আন্ নিসায়ও জিহাদের আলোচনা প্রায় বিস্তারিতভাবেই এসেছে। এছাড়া সূরা আল আহ্যাব, সূরা আল হাদীদ, সূরা আল ফাত্হ, সূরা আছ্ ছফ্ এবং সূরা মুহাম্মদ (যার অপর নাম সূরা ক্বিতাল)-এর নামকরণতো জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। সুতরাং এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ পাকের খাছ রহমত স্বরূপ, সেই জিহাদকে সন্ত্রাস মনে করা কিংবা সরাসরি এর বিরোধিতা করা সেই দ্বীনের অনুসারীদের জন্যই জায়িয হতে পারে, যে দ্বীন বৈরাগ্যতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু যেই দ্বীনের অংশ হিসেবে জিহাদ, ক্বিতাল, হদুদ, কাযা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে, সেই দ্বীনের অনুসারীদের জন্য জিহাদকে সন্ত্রাস ভাবা কিংবা যে কোন প্রকারে এর বিরোধীতা করা কিংবা একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু আফসোস আর আফসোস! জিহাদের মাধ্যমে শির্ক, কুফ্র ও বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্ পাকের কালেমাকে সর্বোচ্চে সমাসীন করাই ছিল যে মুসলমানের প্রধান কাজ, সেই মুসলমানদের মাঝেই আজ জিহাদের মহান দায়িত্ব ত্যাগ করে ক্ষণস্থায়ী

লোভ-লালসার ভাগাড়ে আকণ্ঠ ডুবে থাকার মন-মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠছে। আজ তারা জিহাদের নাম শুনলেই সন্ত্রাস মনে করে আত্কে ওঠে।

ইসলামের চিরশত্রু ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক ও কাদিয়ানীরা চিরকালই জিহাদকে হত্যা-সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর মানবতা-বিরোধী কাজ বলে প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে এসেছে এবং আজও চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভাষায় মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী, জিহাদপন্থী ঈমানদারগণ মৌলবাদী এবং অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনা-পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার জন্য জিহাদ চালিয়ে যাওয়া মুসলমানগণ হচ্ছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী দাঙ্গাবাজ জঙ্গীগোষ্ঠী। এদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পশ্চিমা মিডিয়াও ব্যাপকহারে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অবশ্য মিডিয়ার বক্তব্যে আরও কিছু নতুন প্রপাগান্ডা যোগ হচ্ছে, যেমন ইসলাম সন্ত্রাসবাদের ধর্ম, মুসলমানগণ রক্ত পিপাসু এক উচ্ছৃঙ্খল জাতি প্রভৃতি। ইসলামবিরোধীদের এই অপপ্রচারের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই আজ মানবতার মহান মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হয়ে যান সন্ত্রাসী। মর্দে মুজাহিদ ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর, জওহর দুদায়েভ, মাসউদ আয্হার প্রমূখ আখ্যা পান মৌলবাদী সন্ত্রাসের জনক হিসেবে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুজাহিদরা সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসবাদী নন, ছিলেনওনা কোনদিন; আর জিহাদও সন্ত্রাস নয়। উদাহরণস্বরূপ, পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে সূদীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ এবং প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ ক্রুসেড চলাকালীন নাবীয়্যুল মালাহিম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উম্মত (যারা এই জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারা) নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের মহোৎসব করেনি; বরং বিজিত শত্রু যখনই সন্ধির প্রস্তাব করেছে– তারা শরীয়তের বিধান মোতাবেক তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেছে এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালনও করেছে। অথচ প্রতিপক্ষ ইয়াহুদী-খৃষ্টান চক্র বরাবর প্রথম সুযোগেই সন্ধি ভঙ্গ করেছে এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ইতিহাসের এসব নির্মম সত্য গোচরে থাকার পরও একশ্রেণীর লোক কথায় কথায় জিহাদকে সন্ত্রাস আর মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করতে পুলক বোধ করেন। আবার এরাই যখন বিগত তেপান্ন (৫৩) বছর যাবত ইসরাইলীদের হাতে ৪ লক্ষেরও অধিক ফিলিস্তিনীর হত্যাকে জায়েয করার জন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি দেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তা সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণের

প্রয়োজনীয়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত এরাই সেই তথাকথিত সুশীল সমাজ ও কাপালিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী; যারা নির্বিচারে নিরীহ, নিষ্পাপ মানুষের উপর পারমানবিক অস্ত্রের ঘৃণ্য ব্যবহার করলেও সেটা হয় প্রগতি আর কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, মিন্দানাও, জিনজিয়াং, আরাকান, মেসেডোনিয়ার শোষিত-বঞ্চিত-প্রবঞ্চিত মুসলমানরা আত্মরক্ষার সামান্য চেষ্টা করলেও তাদের ভাষায় সেটা হয়ে যায় সন্ত্রাস। এই যখন বিশ্ব মুসলিমের বর্তমান অবস্থা, তখনও কিন্তু ইসলামের চিহ্নিত শত্রুদের জিহাদ বিরোধী প্রপাগান্ডা আমাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না। একসময় মুসলমানদের জিহাদী জজ্‌বার সম্মূখে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা আর জিযিয়া কর দিয়ে বেঁচে থাকা ভিন্ন অন্য কোন পথ ইয়াহুদী-নাসারাদের সম্মুখে খোলা ছিলনা। কিন্তু আজ তাদেরই অপবাদ-অপপ্রচারে ভীত, প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামী প্রচার মাধ্যম ও লেখকগণ জিহাদের ব্যাপারে এমন 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' সুলভ আচরণ করা শুরু করেছে এবং ইসলামের বিজয় ও জিহাদকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে হেড লাইন করার পরিবর্তে মর্দে মুজাহিদগণের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে এমনভাবে উপস্থাপন করছে যে, মনে হয় এসব ঘটনা ঘটার বা ঘটানোর জন্য মুসলমানরা খুবই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত; আসলে একান্ত বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার্থে মুসলিম বীরগণ এমনটি করেছেন। নচেৎ ঐযে তীর-ধনুক-তরবারি, ট্যাঙ্ক-কামান-মোশিনগান-রাইফেল তথা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ, ওসবের সঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের আদৌ কোন সম্পর্ক কস্মিনকালেও ছিলনা এবং আজও নেই। আয় আল্লাহ্! এই শিক্ষা গ্রহণের জন্যই কি তুমি কুরআনের মাঝে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলে? এই আচরণ প্রদর্শনের জন্যই কি তুমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জিহাদকে ফরয করেছিলে? কে এদের বুঝাবে, জিহাদ তোমার খাস রহমত, এটি কোনমতেই সন্ত্রাস নয়, যেমন মুজাহিদ নয় সন্ত্রাসী। অতএব এর জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জা-অপমান বা অনুতাপ-অনুশোচনারও কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ইতিহাসের পাতায় একটু কষ্ট করে নজর বুলালেই আমরা দেখতে পাবো যে, ইসলামী জিহাদের প্রবক্তা নাবীয়্যুল মালাহিম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মাত্র দশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে কম-বেশী আশি (৮০)টি জিহাদী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জাযীরাতুল আরবে একটি প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। আর দশ বছরের এ সংক্ষিপ্ত সময়কালে

দৈনিক প্রায় ২৭৪ বর্গমাইল এলাকা ইসলামের অধীনে এসেছে। অথচ এই আশিটি যুদ্ধে জীবন হানির হিসাব নিলে দেখা যায় গড়ে মাসে মাত্র দশজন মানুষ নিহত হয়েছে। তবে সময় দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দশ লাখ বর্গমাইল এলাকা ইসলামের পদানত হয়েছে। নবী করীম (ﷺ)-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আশিটি জিহাদে উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ

মুসলিম পক্ষ : শহীদ–৪৫৯ জন, আহত–১২৭ জন, বন্দী–১১ জন।

শত্রু পক্ষ : নিহত–৫৫৯ জন, বন্দী–৬৫৬৪ জন।

সুব্হানাল্লাহ্! এরই নাম জিহাদ, এরই নাম হক্ব।

তো জিহাদের কথা যখন এতো বলা হলো, তখন বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রের সোল এজেন্ট, মানবতাবাদের তক্মাধারী কতিপয় যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কেও কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন বৈকি! তবে ওসব কথিত মানবতাবাদীদের যুদ্ধের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে হিরোশিমা-নাগাসাকির বিভীষিকাময় ঘটনার কথা না হয় নাই বললাম; আর চেচনিয়া, বসনিয়া, মেসেডোনিয়া, ফিলিস্তিনের রক্ত ঝরার ফিরিস্তি তো আজও ইতিহাসের পাতায় রক্তের আখরে লেখা হচ্ছে। তাই নবী করীম (ﷺ)-এর আশিটি সামরিক অভিযানের বিপরীতে ওসব তথাকথিত মানবতাবাদী গণতন্ত্রবাজদের পরিচালিত মাত্র দু'টি যুদ্ধের কথাই এখানে উল্লেখ করতে চাই যার প্রথমটির স্থায়ীত্বকাল ছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল এবং দ্বিতীয়টির স্থায়ীত্বকাল ছিল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। উল্লিখিত যুদ্ধ দু'টি বিশ্ববাসীর নিকট প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। একই লক্ষ্যে সংঘটিত যুদ্ধের প্রথমটিতে নিহতের সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজারে গিয়ে থামলেও দ্বিতীয়টিতে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে তিন কোটি এবং ছয় কোটির মাঝে কোন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল; কিন্তু হায়! বিরতিহীন দীর্ঘ সময় ধরে চলা অসংখ্য মানব সন্তানের প্রাণ সংহারী এ দু'টি যুদ্ধ বিশ্ব মানবতার কোনো খিদমতই আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয়নি শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ আর শত্রুতা সৃষ্টি ছাড়া।

সুতরাং মুক্তিকামী, হিদায়াত প্রত্যাশী অথচ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের নিকট নিশ্চয়ই বিষয়টা স্বচ্ছ হতে হবে যে, জিহাদ প্রচলিত যুদ্ধের সমার্থক নয় এবং তা কোনো মতেই সন্ত্রাস নয়। এছাড়া

আশিটি জিহাদে হতাহতের সংখ্যার বিপরীতে মাত্র দু'টি প্রচলিত যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যার বিশাল পার্থক্যও এ বিষয়টিই প্রমাণ করে যে, মুজাহিদগণ প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী বীরযোদ্ধা, সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসবাদী নন; বরং প্রচলিত যুদ্ধবাজ ইয়াহুদী-খৃষ্টান-মুশরিকরাই ঠাণ্ডা মাথার খুনী, পরিকল্পিত সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসবাদের জনক ও গর্ভধারিণী।

মহান আল্লাহ্ পাক ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের যেকোনো ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে মু'মিনদের এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাথে বিরোধ বা শত্রুতা হলে তা হবে একমাত্র এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধে। এ প্রসঙ্গে কালামুল্লাহ্য় ইরশাদ হয়েছে–

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

'(হে ঈমানদারগণ!) তোমরা তাদের (অর্থাৎ ইসলামবিদ্বেষীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিত্না-ফাসাদ সমূলে বিদূরীত হয় এবং গোটা সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।' (সূরা আল আনফাল : ৩৯)

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব বা একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজ থেকে সর্বপ্রকার ফিত্না-ফাসাদের মূলোৎপাটন করার জন্যই জিহাদ চালিয়ে যেতে বলা হচ্ছে; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের খতম করার উদ্দেশ্যে নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম ও প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টিকারীদের অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের ওপর তাঁর প্রভূত্বের পরিবর্তে কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রভূত্ব কায়েম করার মাধ্যমে আল্লাহ্-দ্রোহীতার ন্যায় চরম ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই প্রকৃত মানব প্রেমের উদাহরণ।

একমাত্র ইসলামই আল্লাহ্ পাকের মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আর এর মাঝেই রয়েছে জাতি-গোষ্ঠী-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, যার নজীর অন্য কোনো ধর্মে বা জাতির মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে অমুসলিমতো বটেই, অধিকাংশ মুসলমানের পর্যন্ত স্পষ্ট ধারণা নেই; ফলে অমুসলিমদের

মতো বর্তমানের অধিকাংশ মুসলমানও ইসলামী রাষ্ট্রের সুশীতল আশ্রয়স্থলের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সুখ-সমৃদ্ধি তালাশ করে ফিরছে। প্রকৃতপক্ষে, অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সমাজের তুলনায় ইসলামী সমাজেই অধিক, যে কারণে ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য তাদের স্বধর্মীয় কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের চেয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামী দল অধিকতর কল্যাণকামী ও প্রকৃত মানব বন্ধু।

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের জন্যও ঠিক ঐরূপ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে; যেরূপ নিরাপত্তা ঐ রাষ্ট্রের মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে নবীয়ে রহমত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–'তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায় এবং তাদের ধন-সম্পদ আমাদের ধন-সম্পদের ন্যায় পবিত্র।' (সহীহ্ বুখারী)

অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রে বিধর্মীদের জান ও মাল মুসলমানদের জান ও মালের ন্যায় পবিত্র ও নিরাপত্তার যোগ্য। সুতরাং আল্লাহ্র জমীনে আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদ কোনো ক্রমেই 'সাম্প্রদায়ীকতা' নয় বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী নয়; বরং এ পথই একমাত্র মুক্তির পথ। আর জিহাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার নামে ধর্মনিরপেক্ষতাও কোনো সমাধান নয়; বরং জিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামই সমগ্র মানব জাতির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রকৃত রক্ষা-কবচ এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল।

সুব্হানাল্লাহ্! সত্য প্রকাশিত, মিথ্যা দূরীভূত।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ জিহাদের আলোচনায় পূর্ণ। এ জিহাদকে জানতে ও বুঝতে হলে চাই স্বচ্ছ ধারণা ও জ্ঞান। বিশেষ করে একবিংশের এ লগ্নে যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজার রকম শত্রুতা শুরু হয়েছে। আদর্শিক সংকট আর নৈতিক দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি আজকের পৃথিবীকে চিরকল্যাণ ও সাফল্যের পথে নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী একমাত্র ব্যবস্থা ইসলাম আজ সম্মিলিত বিরোধী শক্তির চূড়ান্ত আঘাতের সম্মুখীন। এমতাবস্থায় ইসলামের জিহাদী আদর্শকেই বেশী করে টার্গেট করা হচ্ছে। কেননা, শত্রুরা জানে যে, ইসলামের শক্তি এখানেই যে, এর অনুসারীরা

আল্লাহ্‌র আওয়াজকে সর্বোচ্চে বুলন্দ করার জন্য অকাতরে জীবন, যৌবন, স্বজন ও সম্পদের নজরানা পেশ করতে জানে। আর এই বিষয়টির মুকাবালা করাই বৈরী শক্তির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্ত। অতএব, মুজাহিদদের উপর যত দমন পীড়ন আর জিহাদের যত বদনাম!

সে সময়ের কথা বলছি, যখন মুসলমানরা জিহাদের ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ আমলের পাবন্দ ছিলো। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিতো। রোম সে সময় পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি ছিল। অথচ রাসূল মুহাম্মদ ﴿ﷺ﴾ দূত মারফত সেই রোম সম্রাটের নিকটই পত্র প্রেরণ করলেন যাতে আলটিমেটাম (চরমপ্রস্তাব) দেয়া ছিল– 'ইসলাম গ্রহণ কর, তোমাদের দ্বীন-ধর্ম, জান-মাল, পরিবার-পরিজনের সার্বিক নিরাপত্তা দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে মেনে নাও। অন্যথায় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' কিন্তু আফসোস! ইসলামের 'সর্বোচ্চ চূড়া' জিহাদের আমলকে পরিত্যাগ করার জিল্লতিস্বরূপ আজ খৃস্টান-ইয়াহুদীরাই আমাদের উল্টো আলটিমেটাম দিচ্ছে– 'সর্বক্ষেত্রে আমাদের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব মেনে নাও, আমরা তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তা দিব (অবশ্যই ঈমানের নিরাপত্তা নয়)।' কোন কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তো যেচে গিয়ে তাদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে স্বীয় জান-মাল (দেশবাসীর নয়) ও ক্ষমতার মসনদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি চেয়ে রীতিমত ভিখ মাগছে। উদাহরণস্বরুপ, ইসলামী সরকার পরিচালিত আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষ পীড়িত শত-সহস্র শিশু ও নারীর সাহায্যের জন্য একটি ডলারও যাদের হাতে উঠেনি তাদেরই একজন সৌদি রাজপুত্র তালাল ১৯.১০.২০০১ তারিখে 9/11 এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানিয়ে ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) ডলারের একটি চেক নিউইয়র্কের মেয়রকে প্রদান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কি এক অদৃশ্য কারণে তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন (*সূত্র : CNN*)।

মহান আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আয়াত সমূহের মধ্যে সালাত (নামায) সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা যেক্ষেত্রে ৮২ সেক্ষেত্রে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা অন্যূন ৬৮১। সুব্‌হানাল্লাহ্‌! অসংখ্য শুকরিয়া ঐ মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইয্‌যতের দরবারে যিনি আল কুরআনে জিহাদকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছেন। জিহাদ দ্বীনের স্তম্ভ; জান্নাতের সদর রাস্তা। যাঁরা জিহাদে শরীক

হন, তাদের সামনে খুলে যায় জান্নাতের দরজা। ক্ষমতায় মদমত্ত জালিম, কাফির, মুশরিকদের জুলুমবাজির প্রতিরোধকল্পে জিহাদে সর্বশক্তি নিয়োগ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যারা পালন করতে চান না কিংবা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান, তারা নিঃসন্দেহে মুনাফিক। আর মুনাফিকদের জন্য আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরকে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

যদি কোন মুসলমানের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান ও ইসলামের প্রতি মুহাব্বাত অবশিষ্ট থেকে থাকে তবে তার পক্ষে সম্ভবপর নয় যে, সে সত্যের এ আহ্বান শ্রবণ করে আপাদমস্তক প্রকম্পিত না হয়ে থাকতে পারে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

'ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের আহ্বান করা হয়–তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদে বের হও, তখন তোমাদের পা ভারী হয়ে যায়, তোমরা অগ্রসর হও না? তোমরা কি আখিরাতের জীবন পরিত্যাগ করে শুধু দুনিয়ার জীবনের উপরই পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? (অবস্থা যদি এরূপই হয়, তবে মনে রেখো–) যে জীবনের উপর তোমরা পরিতুষ্ট হয়ে আছো তা আখিরাতের (অনন্ত) জীবনের তুলনায় অতি নগন্য।' (সূরা আত তাওবা : ৩৮)

আল্লাহ্র অস্তিত্ব যেমন সত্য কিয়ামতও তেমন সত্য। সুতরাং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র সম্মুখে কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় আমরা কী জবাব দিবো, যখন জিজ্ঞেস করা হবে– 'তোমরা তো সংখ্যায় নগন্য ছিলে না; বরং কোটি কোটি মুসলমান জীবিত ছিলে, আমার প্রদত্ত অফুরন্ত রিযিক, নেয়ামতরাজি ভোগ করে সহী-সালামতেই ছিলে, তোমাদের দেহ থেকে আত্মাও বের করে নেয়া হয়নি, শক্তিও ছিনিয়ে নেয়া হয়নি, তোমাদের কর্ণ বধির ছিলনা, দৃষ্টিও অসহযোগীতা করেনি, দু'টি সুস্থ্য হাত ছিল, পাও পঙ্গু ছিলনা অথচ এরপরও তোমাদের কী হয়েছিল যখন আফগান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, গুজরাট, আরাকান, মিন্দানাও, জিনজিয়াং, বসনিয়া, চেচনিয়া আর

মেসেডোনিয়ায় তোমাদের সম্মুখে তোমাদের তরুণ তাজা ভাইদের বুক মানুষরূপী হিংস্র হায়েনাদের তপ্ত সোনালী বুলেটের আঘাতে আঘাতে ঝাঁজরা হলো, দুশমনের নিক্ষিপ্ত শত-সহস্র টন বোমায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো সাজানো-গোছানো একটি দেশ, বর্ণনাতীত পাশবিক অত্যাচারের শিকার হলো লক্ষ-কোটি মা-বোন, অগণিত মুসলমান গৃহহীন হলো, বাধ্য হলো দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে, ইসলামী ইমারত শত্রুর শক্তিদর্পে পদানত হলো? হায়! এসব প্রত্যক্ষ করে তোমাদের অন্তর না এতটুকু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, না তোমাদের পা এতটুকুও প্রকম্পিত হয়েছে আর না তোমাদের চক্ষু এক বিন্দু শোক ও ভালবাসার অশ্রু উপহার দিয়েছে আর না মজলুম ভাইদের সাহায্য-সহযোগীতাকল্পে তোমাদের ধনভাণ্ডার থেকে কৃপণতা ও সম্পদপূজার তালা টুটেছে? তোমরা শুধু নিজ নিজ পরিবার নিয়ে কিভাবে আরও অধিক দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতে পারবে সে ফিকির করেছ আর আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে শুয়ে টিভির পর্দায় মুসলমানদের ধ্বংস ও বরবাদীর 'লাইভ শো' (Live Show) দেখেছ। তোমরা কি শুধু দুনিয়ার জীবনেই তুষ্ট ছিলে? অথচ তোমাদের তো সুস্পষ্টভাবেই অবহিত করা হয়েছিল আখিরাতের (চিরস্থায়ী অনন্ত) জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ অতি তুচ্ছ!'

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা সত্যিই কঠিন। তবে তারও চেয়ে অধিক কঠিন হলো—বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়া; আল্লাহ্‌র রাস্তায় সাধ্যমত জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা। অথচ এই কঠিন কাজটিই হাসিমুখে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে করে গিয়েছেন আমাদের সর্বশেষ নবী আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) ও তাঁর সহচরগণ (رضي الله عنهم)। কারণ, তারা জানতেন, জান্নাতে যাওয়ার জন্য জিহাদের ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ আমল আর নেই। জিহাদ ত্যাগ করে জান্নাত লাভ না হোক, অন্তত জাহান্নাম থেকেও যদি মুক্তি পাওয়া যেত, তবে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (ﷺ) দুনিয়াবী আরাম আয়েশের পরিবর্তে চরম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে জিহাদে শরীক হতেন না; জিহাদের ময়দানে শত্রুর আঘাতে তাঁর পবিত্র দাঁত মোবারক শহীদ হতো না; আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় দেহ মোবারক হতে খুন ঝরতে দিতেন না; এমনকি নবীজীর (ﷺ) প্রাণপ্রিয় চাচা হযরত হামজা (رضي الله عنه) সহ শত শত সাহাবীকেও জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণ করতে হতো না।

ইসলামে বল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জিহাদকে ফরয করা হয়নি। যদি তাই হতো, তবে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে তরবারি শোভা পেত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হিজরতের পূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে কেউ তরবারি উঠতে দেখেনি। কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানচক্রের চতুর্মুখী আক্রমণে ইসলাম গ্রহণকারীদের পক্ষে যখন আত্মরক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তারা হিজরতের মাধ্যমে দেশ ত্যাগের নির্দেশ পেয়েছেন। হিজরতের পর ইসলামের সত্যতার নিদর্শন যখন অত্যুজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হলো তখন দুশমনরা গায়ে পড়ে আক্রমণ করার জন্য নানা দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দিলেন–

وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আল বাক্বারা : ১৯০)

মহান আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা এ অনুমতিরও অনেক পরে মুসলমানদের জন্য জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে ফরয করে দিলেন। অর্থাৎ পূর্বে যেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে জিহাদের অনুমতি ছিল, বর্তমানে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পাশাপাশি আল্লাহ্ পাকের মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, অসত্য, অনাচার, তাগুত ও শির্‌কের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলো। এ নির্দেশের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরয হওয়ার পর একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকলেও এসব যুদ্ধের উদ্দেশ্য কখনোই এমনটি ছিলনা যে, মানুষের শিরে তরবারি রেখে তাদেরকে মুসলমান হতে বলা হবে। কোনরূপ চাপ বা বল প্রয়োগে মানুষকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি তখনও ছিল না, বর্তমানেও নেই। কিন্তু হায়! অতি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বেশ কিছুদিন যাবৎ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী চালবাজগণ এবং তদীয় উচ্ছিষ্টভোগীরা জিহাদের নানা অপব্যাখ্যা করে এবং প্রতারণামূলক মন্তব্য সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশ করে এর প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সীমাহীন প্রপাগান্ডা চালিয়ে

যাচ্ছে। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার পরও শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এরা প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে– 'জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো এবং গণিমতের নামে লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা।' এদের বক্তব্য যদি সত্যিই ধরে নেই, তবে বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার অমুসলিমরা কাদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে কিংবা কারা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে কিংবা ভারতবর্ষ ৫০০ বছর মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকার পরও সেখানে অমুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন? এর জবাব তারা কী দিবেন? অপপ্রচার যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা; প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা; গণিমতের লোভে কোন অমুসলিম দেশ বা এলাকায় হামলা করা, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি অন্যায় আক্রমণ করা–এসব কোনকিছুই জিহাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে– অনধিকার চর্চার অবসান করা; দুনিয়ার বুক থেকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও অশান্তিকে দূর করা; আল্লাহ্‌র জমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা; সর্বোপরি দুনিয়ায় ন্যায়বিচার, অধিকার, শান্তি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা। জিহাদের মাধ্যমে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অমুসলিমদের এ বিভ্রান্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা কতইনা সুস্পষ্ট!

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ

وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

'দ্বীন (ইসলাম গ্রহণ) সম্পর্কে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে পৃথক হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল বাক্বারা ২৫৬)

অর্থাৎ, বলপ্রয়োগে ভিন্ন ধর্মের লোককে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ্‌পাক ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে কোনো অমুসলিমের সাথে শত্রুতা বা বিদ্বেষমূলক আচরণও করতে বলেননি। ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্তদের অহেতুক শত্রু ভেবে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে তাদের ধ্বংস বা ক্ষতি কামনা করাও ইসলাম পরিপন্থী। উল্লিখিত আয়াতটির প্রথম

অংশ নিয়ে প্রায়শঃই এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, ইসলাম ধর্মে যদি বলপ্রয়োগ না-ই থেকে থাকে তবে জিহাদ ও ক্বিতালের শিক্ষা দেয়া হয়েছে কেন? এক্ষেত্রে একটু গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলেই বোঝা যাবে যে, জিহাদ ও ক্বিতাল প্রসঙ্গে এরূপ প্রশ্ন যথার্থ নয়। কেননা, ইসলামে জিহাদ ও ক্বিতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি; বরং ফিত্‌না-ফাসাদকে বন্ধ ও নির্মূল করার লক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে।

জিহাদ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সামান্য জিযিয়া করের বিনিময়ে স্বাধীনভাবে কোন মুসলিম দেশে থাকার অনুমতি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– একবার হযরত উমর (رضي الله عنه) খৃষ্টান সম্প্রদায়ভূক্ত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে যখন ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন, তখন জবাবে স্ত্রীলোকটি বলল: আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাড়ানো এক বৃদ্ধা, শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর (رضي الله عنه) একথা শুনে ক্রোধান্বিতও হননি, তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্যও করেননি। বাস্তবিকপক্ষে বলপ্রয়োগের দ্বারা কাউকে ঈমান আনয়নে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব নয়। জিহাদ ও ক্বিতালের দ্বারা শুধুমাত্র বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়ে থাকে, ঈমান নয়। কারণ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই। জিযিয়া করের ন্যায় সামান্য ট্যাক্সের বিনিময়ে অমুসলিমদের পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ; রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি ইনসাফপূর্ণ ইসলামী বিধান এটাই প্রমাণ করে যে, জিহাদ মুসলমানদের জন্য ফরয ঘোষিত হবার পরও তা কাফিরদের জন্য জবরদস্তি মূলক ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে তাদের নিজস্ব মতামতকে সম্মান দেখিয়েছে। তবে যারা অহেতুক বিদ্বেষপরায়ণ ও সঙ্কীর্ণচেতাদের ন্যায় হীন মনোবৃত্তির অধিকারী নন তারা অতি সহজেই জিহাদের চিরন্তন সৌন্দর্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এ বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করতে তাদের কোন অসুবিধাই হয় না যে, জিহাদের ভয়ে কিংবা বল প্রয়োগে নয়; বরং ইসলামের স্বর্ণযুগে যারা ইসলাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান হয়েছিলেন তারা সকলে জিহাদের শাশ্বত সৌন্দর্যে, ইনসাফপূর্ণ আচরণে, মহত্ত্বে, উদার নীতিতে সর্বোপরি হক্ব ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশকারী দ্বীন ইসলামের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই ইসলামে দাখিল হয়েছিলেন।

খৃষ্টানদের বর্তমান চরিত্রকে বিবেচনায় না এনে আমরা যদি খৃষ্টধর্মের দিকে তাকাই, তবে অবিশ্বাস্যভাবে দেখতে পাবো যে, খৃষ্টধর্মে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খৃষ্টধর্মে যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার বাণী নিয়ে এসেছিলেন যীশুখৃষ্ট বা ঈসা (عليه السلام)। খৃষ্টানদের প্রচলিত বাইবেলের মথি ; ৫ ; ৩৯, ৪১-এ যীশুখৃষ্ট বলেছেন– 'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা মন্দ কার্যে বাধা প্রদান করিও না; কেহ যদি তোমাদের ডান গালে চড় মারে, তবে তাহার দিকে তোমাদের বাম গালও আগাইয়া দিও...; কেহ যদি তোমাদিগকে এক মাইল যাইতে বাধ্য করে, তোমরা তাহার সঙ্গে দুই মাইল যাইও।' তবে খৃষ্টধর্ম শুধুমাত্র যুদ্ধই নিষিদ্ধ করেনি, অস্ত্র-শস্ত্র বহন পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছে। যেমন, বাইবেলের মথি ; ২৬ ; ৫২-এ যীশুখৃষ্ট সেন্ট পিটারকে বলছেন– 'তোমরা তলোয়ার যথাস্থানে রাখিয়া দাও। কেননা, যাহারা তলোয়ার ধারণ করে তাহারা তলোয়ারের সহিতই ধ্বংস হইয়া যায়।' কিন্তু হায়! জিহাদকে যারা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে রক্তপাত, বাক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করতে এবং জিহাদকে ফরয ঘোষণা করার কারণে গোটা ইসলাম ধর্মকেই যারা সন্ত্রাসবাদের ধর্ম বলে প্রপাগাণ্ডা চালাতে অভ্যস্ত, সেই খৃষ্টানরাই একসময় যীশুখৃষ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ যুদ্ধকে আত্মরক্ষার্থে এবং অত্যাচারিতকে রক্ষা করার জন্য অনুমোদন দিতে বাধ্য হলো। দীর্ঘ এক হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে নানা আলোচনা ও বিতর্কের পর যুদ্ধ সম্পর্কে খৃষ্টানরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল (অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে ও অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে যুদ্ধই হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ) ইসলাম তা বহু পূর্বেই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে অনুমোদন করেছিল। মূলত একটু দেরীতে হলেও খৃষ্টানরা 'জিহাদ বা ন্যায়যুদ্ধ ব্যতীত কোন দ্বীন (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না' এ চিরন্তন সত্যটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যা তাদেরকে যীশুখৃষ্টের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আত্মরক্ষার্থে ও অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে ন্যায়যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতে প্ররোচিত করেছিল। যদিও পরবর্তীতে খৃষ্টানরা যীশুর প্রকৃত ধর্ম ও মিশনকে ভুলে গিয়ে লোভ, অহংকার, উচ্চাকাঙ্খা এবং স্বার্থচিন্তায় আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং একজন প্রকৃত বিবেকবান, বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে এ সত্যটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয় যে, জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, এক আল্লাহ্‌ই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধানই নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক, যা একটি প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অনুপম সৌন্দর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন এমন একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মিস্টার সি. পি. স্কট বলেন– 'ইসলামের আগমন যুদ্ধের নির্মমতাকে অনেকাংশে হাল্কা করে দিয়েছে। উহা বিজিতদেরকে ইসলাম গ্রহণ সাপেক্ষে পূর্ণ আযাদীর অধিকার দিয়েছে; আর হতভাগ্য বন্দীদেরকে অবিচার ও নিষ্পেষণ হতে রক্ষা করেছে।' (স্পেনের ইতিহাস : ১ম খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কালামে পাকে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইয্‌যত ঘোষণা করেন–

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ
فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

'যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।' (সূরা আন নিসা : ৭৬)

উল্লিখিত আয়াতটিতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মু'মিন বা ঈমানদারগণ জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে আর কাফিরগণ যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এ থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁকে রাজি-খুশী রাখাই মুখ্যত মু'মিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে বাতিল ও তাগুতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়াই জিহাদের উদ্দেশ্য।

সাধারণ যুদ্ধের ইতিহাসে আমরা দেখে থাকি যে, কোন দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সে দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, বিজয়ী পক্ষ দ্বারা বিজিত পক্ষ পদদলিত হয়। অথচ জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ের চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম কখনো মানবতার বিরুদ্ধে জিহাদ

ঘোষণা করেনি। ইসলাম বরাবরই জিহাদ করেছে শির্ক ও কুফ্রের বিরুদ্ধে; অসত্য, অন্যায় ও তাগুতের বিরুদ্ধে। মূলত এ কারণেই দেখা যায়, জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম যখন বিজয়ী হয়েছে, তখন কোন দেশ বা জাতির মেরুদণ্ডতো ভাঙেইনি উপরন্তু তা আরও মজবুত হয়েছে। বিজিতগণ বিজয়ীদের দ্বারা পদদলিত হবার পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বদর যুদ্ধের বন্দীদের নিজ মুখের ভাষ্য এরূপ– 'মদীনাবাসীদের উপর আল্লাহ্র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক; তারা পায়ে হেঁটে চলে আমাদেরকে উটে বসিয়ে এনেছেন। ক্ষুধায় নিজেরা সামান্য খেজুর খেয়ে আমাদেরকে তৃপ্তির সাথে আহার করিয়েছেন।'

ইসলামী জিহাদ তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার পশ্চিমা জাতিসমূহের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ নয়; যাতে স্বীয় কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নারী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আজকাল অধিকাংশ ইসলামবিরোধী শক্তিকেই দেখা যায়, শত্রুকে পূর্বে সতর্ক না করেই অতর্কিতে আক্রমণ করাকে তারা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। এরা এত গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে যে, প্রতিপক্ষ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকা অবস্থায়ই তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে হতচকিত করে দেয়া হয়। এছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রকাশেও এরা প্রতারণাপূর্ণ আচরণ করে থাকে। আধুনিক সভ্যতা ও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ধ্বজাধারীরা এরূপ প্রতারণায় এত বেশী সিদ্ধহস্ত যে, মানবেতিহাসে তা অভূতপূর্ব। তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন সব প্রতারণামূলক শর্তাধীনে চুক্তি সম্পাদন করে যা প্রতিপক্ষকে তাদের নিজেদের নিরাপত্তায় আগ্রহী রাখে। অথচ নিরাপত্তার এ প্রতিশ্রুতি নিছক ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী জিহাদ আল্লাহ্র এক অসীম নে'য়ামত। তাই ইসলামী জিহাদে এসব প্রতারণামূলক আচরণের বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্যতা নেই ; বরং যারা এ ধরনের আচরণের আশ্রয় নেয় তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য এবং তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র অবশ্যম্ভাবী লা'নত।

জিহাদের বিধিবদ্ধ আইনানুসারে মুসলমানদের সাথে যদি বাতিল ও তাগুতের সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ অনিবার্য, তাহলে সর্বাগ্রে প্রতিপক্ষকে সাবধান করে দেয়া মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া প্রতিপক্ষ যদি আলাপ-আলোচনা করতে চায় (অবশ্য প্রতারণামূলক

সময়ক্ষেপণ যদি এর উদ্দেশ্য না হয়) তবে তাদেরকে পর্যাপ্ত সময়ও দিতে হবে। এটা এজন্য যে, প্রতিপক্ষ যেন তার দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে এ যুদ্ধের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। জিহাদের স্পষ্ট বিধান মতে, শত্রুদেরও কতিপয় অধিকার রয়েছে যা যুদ্ধের অজুহাতে লঙ্ঘন করা যায় না। শত্রু যদি এমন এক দেশে বাস করে, যে দেশ তার প্রকৃত দেশের শত্রু কর্তৃক শাসিত হয় তবুও তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করা যাবে না বা তাদের জীবন বিপন্ন করা যাবে না। তাদেরকে প্রকৃত জন্মভূমিতে ফিরিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত না করা পর্যন্ত তাদের জীবন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তাদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়ার পরই কেবল তাদের প্রতি যুদ্ধের সময়কার শত্রুসুলভ আচরণ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

'মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের কাছে আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে না পারছে। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। কারণ, তারা অজ্ঞ লোক।' (সূরা আত্ তাওবা : ৬)

তবে উল্লেখ্য যে, এ আয়াতের হুকুম ঐসব শত্রুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা তাদের প্রবাসী দেশের আইন-কানুন মেনে চলতে অভ্যস্ত, আচরণে শালীন এবং প্রবাসী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য ক্ষতিকর কোন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ হতে বিরত রয়েছে। মূলত যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রু-নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত ইসলাম স্থাপন করেছে তার ভিত্তি হলো সাম্য এবং ইনসাফ, যা অন্যান্য রাষ্ট্র-জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান না থাকার কারণে তারা হর-হামেশা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হচ্ছে। একমাত্র জিহাদের নীতিমালার মাঝেই যুদ্ধ সম্পর্কীয় আচরণের এক মহান ও মহৎ আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। তা হলো যুদ্ধের বিস্তার রোধ এবং নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন না চালানো। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভীষিকা থেকে সাধারণ নাগরিকদেরকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধরত বাহিনীর

মাঝেই যুদ্ধের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ লোকজন মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতি করার বিধান রাখা হয়েছে ইসলামী জিহাদে। এ নীতির আলোকে প্রচলিত যুদ্ধ সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন স্বাভাবিকভবেই সামনে চলে আসে। যেমন, আধুনিক সমরনীতিতে শুধু অস্ত্রধারণকারীর জন্যই কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়; কিংবা চেঙ্গিস, হালাকু খান এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা যুদ্ধনীতিতে যে বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তার সাথে আজকের তথাকথিত আধুনিক সমরবাজদের পার্থক্য কোথায়?

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার! মানবাধিকার!! গণতন্ত্র! গণতন্ত্র!! বলে চিৎকার করে যাদের গলা দিয়ে রক্ত বের হবার উপক্রম, সেই পশ্চিমাদের যুদ্ধের কিছুটা স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে হিরোশিমা-নাগাসাকির কথা নাইবা বললাম ; আর চেচনিয়া, বসনিয়া, ফিলিস্তিনের ফিরিস্তিতো লিখে শেষই করা যাবে না। তাই সংক্ষেপে বলতে হয়–গণতন্ত্রের নামে যে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাকে সফল করতে প্রাণ গেছে মাত্র (!) ৬৬ লক্ষ লোকের। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রাণ গেছে এক কোটিরও অধিক লোকের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছে ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষ। এছাড়া একই লক্ষ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যাও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি; বরং তা বেড়ে কোটি ছাড়িয়ে যায়। এই যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এত লোকের প্রাণ গেল, তারপরও আমরা দেখতে পাই–সামান্য অজুহাত দেখিয়ে সবল পশ্চিমা শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ছে দুর্বলের উপর, বইয়ে দিচ্ছে রক্তের নদী, বাধিয়ে দিচ্ছে অসম যুদ্ধ। মূলত
ইউরোপীয় জাতিসমূহ যদি প্রকৃত অর্থেই শঠতা ও প্রতারণার পরিবর্তে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সত্য, ন্যায় ও সাম্যের জন্য কাজ করার মানসিকতা পোষণ করতো তবে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ ১৯১৪ সালের যুদ্ধের কারণ হতো না; কিংবা ১৯১৪ সালের যুদ্ধ ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের কারণ হতো না।

হায়! তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার দাবীদারগণ যারা বর্তমান যুগে যুদ্ধ করে বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে নিরীহ নারী-শিশুদের পাইকারীহারে হত্যা করে ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ, শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ম্যাসাকার করে দিচ্ছে এবং এরূপ হিংস্রতা-বর্বরতার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করছে তারা যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর

অনুসৃত ও অনুমোদিত জিহাদের আচরণসমূহ গ্রহণ ও অনুসরণ করতো তবে তা কতইনা উত্তম ও মঙ্গলজনক হতো!

বর্তমানে প্রচলিত যুদ্ধাভিযান বড়ই নির্মম। বর্তমান যুগে বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর অব্যাহত বোমা ও গোলাবর্ষণে সাধারণ নাগরিকগণ যে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হন তা সাড়ে সাতশ' বছর পূর্বে মঙ্গলদের অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। বর্তমানে যুদ্ধরত সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণের সময়ও পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে, যাতে তাদের শত্রু-মিত্র উভয়ই মারা যায়। ইসলাম জিহাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের মানবতাবিরোধী নীতি কখনও কোন অবস্থাতেই সমর্থন করে না। অসহায় নিরস্ত্র নাগরিকদের জান-মালের উপর এ ধরনের বর্বরোচিত হামলার কথা অগ্রসররত বা পশ্চাদপসরণকারী মুজাহিদ বাহিনী কখনও কল্পনায়ও আনতে পারে না।

প্রচলিত যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত-আত্মসমর্পণকারী সৈনিক বা বেসামরিক লোকজন চরম নির্যাতন ও গণহত্যার শিকার হন। অথচ জিহাদের সাধারণ নিয়মানুসারে আত্মসমর্পণকারী সৈনিক বা বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করা বে-আইনী। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ প্রয়োজনে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছিলেন বনূ কুরায়জার ক্ষেত্রে।

চলমান আলোচনা থেকে একটি বিষয়ই বার বার আমাদের সম্মুখে দ্বি-প্রহরের সূর্যের ন্যায় দৃশ্যমান হয়েছে যে, জিহাদ এবং প্রচলিত যুদ্ধ এক নয়। এ সহজ-সরল সত্যটির অকাট্যতা যাচাইকল্পে ইতিহাস অনুসন্ধানে এতদুভয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় যে বৈসাদৃশ্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো– পৃথিবীর বুকে সংঘটিত সিংহভাগ যুদ্ধই হয়েছে হয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে নয়তো ব্যক্তিগত বা জাতিগত মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে; কিন্তু দুনিয়ার বুকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত প্রত্যেকটি জিহাদই হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর কালেমা ও মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে; যার মাঝে আবার অধিকাংশ জিহাদই ছিল ইসলামের শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য।

ইনসাফপ্রিয় প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য এটাই হওয়া উচিত যে, সে অন্তত একবারের জন্য হলেও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুক, কী

উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সাধনের জন্য ইসলামে জিহাদ ফরয করা হয়েছে? যদি এরূপ চিন্তা করে, তবে অবশ্যই সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, ঐ দ্বীন কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, যা মানুষের গলা চেপে ধরে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তার অনুসারী বানায়, ঠিক তদরূপ সেই দ্বীনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, যাতে রাজনীতির স্থান নেই। আবার সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয় যাতে তরবারি ধারণের ব্যবস্থা নেই। উদাহরণস্বরূপ জিহাদবিহীন দ্বীনকে সেই চিকিৎসকের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে, যে কেবল ক্ষত স্থানে মলম লাগাতে জানে; কিন্তু প্রয়োজনবোধে গলিত ও দূষিত অঙ্গে অস্ত্রপচার করতে জানে না। গোটা শরীরকে রক্ষা করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়ে শরীরের কোনো না কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অপারেশনের মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয়। এই অঙ্গহানি আপাতদৃষ্টিতে রোগীর স্বাভাবিক সৌন্দর্যহানির কারণ হলেও রোগীর গোটা শরীর রক্ষায় তা যেমন যুক্তিযুক্ত ঠিক তেমনি বিশ্ব মানবতার বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে সমাজের পচনশীল ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত মানবরূপী শয়তানদের জিহাদী অপারেশনের মাধ্যমে দমন করা আরও অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর তাই বিশ্ব মানবতার শান্তি ও কল্যাণের নিমিত্তে ইসলামের পরিচালিত জিহাদ নীতিই মুসলিম মিল্লাতকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মানব জাতির প্রকৃত বন্ধুরূপে চিহ্নিত করেছে। মানব জাতির মহাকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে দ্বীনের পূর্ণতার জন্য জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) কি চমৎকারইনা বলেছেন–

'খুব ভালো করে অনুধাবনের চেষ্টা করুন, যখন পৃথিবীর দেহে শির্কের বিষাক্ত জীবানু অনুপ্রবেশ করে সমগ্র দেহকে এক রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত দেহের অনুরূপ করে ফেলে, তখন মহান আল্লাহ্ তায়ালা একজন সংস্কারক ও স্নেহশীল চিকিৎসক হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)কে প্রেরণ করলেন। যিনি তাঁর জীবনের তিপ্পান্নটি (৫৩) বছর বিরামহীনভাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শিরা-উপশিরার রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। ফলে, সংশোধনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ্য হয়ে গেল; কিন্তু কোন কোন অঙ্গে এমন পচন দরেছিল যে, সেগুলোর সংশোধনের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রইলো না; বরং পচনশীল অঙ্গের জঘন্য বিষক্রিয়া সারাদেহে সংক্রমিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলো। এক্ষেত্রে

অপারেশনের মাধ্যমে ঐসকল ব্যধিগ্রস্ত অঙ্গসমূহ কেটে ফেলে দেয়াটাই ছিল রহমত ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আর এটাই জিহাদের মর্মকথা এবং সকল আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক জিহাদের লক্ষ্য। রণক্ষেত্রে তীব্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ইসলাম আপন প্রতিপক্ষের মধ্যে কেবল ঐসকল লোককে হত্যা করার অনুমতি দেয় যাদের ব্যধি সংক্রামক অর্থাৎ যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং স্বভাবগতভাবে অপরকেও ইসলামের বিরুদ্ধাচরনের জন্য প্ররোচিত করে।'

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) খুব সংক্ষেপে জিহাদ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন– 'আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, সকল শরীয়তের (দ্বীনের) মাঝে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত সেটাই যাতে জিহাদের বিধান রয়েছে।' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : ৪৬ পৃষ্ঠা)

আলহামদুলিল্লাহ্! সত্য সমাগত; মিথ্যা বিলুপ্ত। মিথ্যাতো বিলুপ্ত হওয়ার জন্যই। সুতরাং যে দুনিয়ার মুহাব্বত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অপমানিত আর লাঞ্ছিত করে প্রতিদানহীন মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাকে ত্যাগ করে আল্লাহ্র কালেমার ঝাণ্ডাকে সর্বোচ্চে সমাসীন করতে প্রয়োজনে মর্যাদাপূর্ণ শহীদী মৃত্যুকে চুম্বন করতে আমাদের সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। যদি আমাদের সংকল্প দৃঢ় হয়, তবে সাফল্য আপনা হতেই ধরা দিবে আর জীবন খুঁজে নিবে মরণ পিয়াসী মুজাহিদকে। তো মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সহায় হোন এবং তাঁর দ্বীনের সম্মান রক্ষার্থে, কালেমার ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখতে আমাদেরকে তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা কায়েমের প্রকৃত মর্দে মু'মিন হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। সর্বাবস্থায় আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি; আমাদের সকল নির্ভরতাও তাঁর উপর; তিনিই আমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক ও সমুদয় শক্তির উৎস। তিনিই আমাদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী, উৎকৃষ্ট সুরক্ষা নিশ্চিতকারী। আর তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে লেখাটির ইতি টানতে বাধ্য হচ্ছি। তবে ইতি টানার পূর্বে খুবই স্পষ্টভাবে বলছি– যারা বিভিন্ন উপায়ে কোমলমতি তরুণ-যুবাদের মাঝে জিহাদের নামে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তারা ইসলামের শত্রু। জিহাদের নামে যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আচার-অনুষ্ঠানে, উপাসনালয়ে বোমা হামলা চালায়, নিজস্ব

মত-পথ প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্নমতের লোকদেরকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে যারা হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর শত্রু, ইসলামের শত্রু, সভ্যতার শত্রু। নব্বই (৯০) ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত দেশে জিহাদের নামে মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় সুইসাইডাল স্কোয়াড গঠন করে দুই-চারজন নিরীহ পুলিশ ও বিচারক হত্যার মাধ্যমে যারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের দিবাস্বপ্নে বিভোর তারা ইসলাম ও মানবতার শত্রু। এরাই ইসলামী জিহাদের অনুপম সৌন্দর্যে কালিমা লেপন করছে, এদের কারণেই আজ মুজাহিগণ হয়ে যাচ্ছেন সন্ত্রাসী আর জিহাদ হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) মোটেও এদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

তো, আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে জিহাদের অনুপম সৌন্দর্য অনুধাবন এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। পরিশেষে আল্লাহ্র দরবারে এই প্রার্থণাই করি–

'আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান, ওয়ার যুকনা এত্তেবায়াহু ওয়া হাব্বীবহু ইলাইনা, ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান, ওয়ার যুকনা এজতিনাবাহু। ওয়া কাররিহ্হু ইলাইনা; ওয়ার যুকনা এত্তেবায়া হাদিঈ রাসূলি রাব্বিল 'আলামীন।'

–হে আল্লাহ্! আমাদের হক্বকে হক্ব হিসেবে বুঝতে দিন এবং এই তৌফিকও দিন যাতে তা অনুসরণ করতে পারি। আর তা আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন। আর বাতিলকে বাতিল বলে বুঝতে দিন এবং তা থেকে বিরত থাকার তৌফিক দিন। আর তা আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন। আর আমাদেরকে তাঁর হিদায়াত অনূসরণ করার তৌফিক দিন, যিনি রাব্বুল 'আলামীনের রাসূল। আমীন ॥

জ্ঞান কুটির

design : najmul haider shoj creation